KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন, (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/- ৬/- ৬/- ৬/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ আষাঢ়, ১৩৬৫ শ্রাবণ, ১৩৬৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 July '58 (0.50) SAMAKAL

ওঁরা দুজনে পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন...
কিন্তু ওঁদের মধ্যে কি আকাশ পাতাল তফাৎ!

ওঁর চেহারা ওঁর প্রতিবেশির মতই, ওঁরা জামাকাপড়ও পরেন প্রায় একইরকম। কিন্তু ওঁদের প্রত্যেকেই এক একজন আলাদা ব্যক্তি—কখনও দেখা যায় দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী, কাজ করার মধ্যে কি অসীম প্রভেদ। সত্যিই লোকজন এবং তাঁদের প্রতিবেশিদের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ সম্বন্ধে জানবার আছে অনেক। হিন্দুস্থান লিভারে, মার্কেট রিসার্চ, অর্থাৎ বাজার যাচাই করার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায়, আমরা তাঁদের প্রয়োজন, আকাঙ্খা, পছন্দ অপছন্দ সব কিছু সম্বন্ধেই জানার চেষ্টা করি। তাঁরা আমাদের আপনার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য অনেক কিছুই জানান, আপনার প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে বুঝতে সাহায্য করেন, আপনার যে ধরনের জিনিষ পছন্দ এবং যেগুলি আপনার রুচী, সামর্থ্য এবং জীবনযাত্রার উপযোগী সে ধরনের জিনিষ তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করেন। এই ভাবে আপনিই আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, আমাদের পথ দেখাচ্ছেন—কারণ আপনার জন্যেই আমরা জিনিষপত্র তৈরী করি, আপনাকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 10-XIII BG

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ
শ্রাবণ ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

ট্রেনের দুরন্ত গতির সঙ্গে তাল রাখা

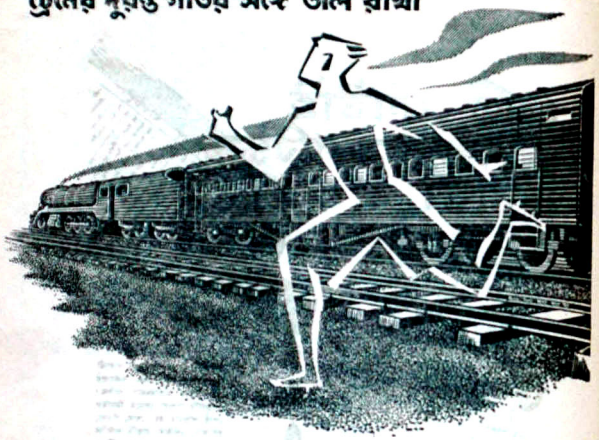

আপনি হয়ত বলবেন—অসম্ভব। কিন্তু তাই তো করছে মানুষ। দিন-রাত প্রতিটি মুহূর্তে দুরন্ত-গতি ট্রেনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছুটে চলেছে মানুষেরই প্রেরণা। আমাদের রেলপথকেও যেন আমরা দুর্বার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারি। সকলের সহযোগিতায় দ্রুত থেকে দ্রুততর হোক তার গতি—মাল ও মানুষ পরিবহনের দায়িত্ব পালনে সমস্ত বাধা-বিপত্তি তার অতিক্রান্ত হোক।

এ আপনারই রেলপথ
আপনার সাহায্যে এর
অগ্রগতি দুর্বার হোক

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ। শ্রাবণ। ১৩৬৫

॥ সূচীপত্র ॥

প্র ব ন্ধ ॥ ঊনিশশতকী জাগরণ এবং একটি বিতর্ক। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২১৭
রবীন্দ্রনাথের কবিমানস। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ২২১
হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতা। সোমেন বসু ২৩৭
অ নু স্মৃ তি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ২৩১
উ প ন্যা স ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২
ক বি তা ॥ ছায়া-ছবি। রমাপ্রসাদ দে ২৪৮
বাদাম গাছের নিচে। সুনীল বসু ২৪৯
আ লো চ না ॥ বিষয় বনাম ভাষা। অশোক ঘোষ ২৫০
গ্রামের দিকে। পবিত্র পাল ২৫২
সমালোচনা। দীপক রুদ্র ২৫৪
স মা জ স ম স্যা ॥ অধিক উৎপাদন ও সুসম বণ্টন। সুরতেশ ঘোষ ২৫৭
স মা লো চ না ॥ সাহিত্যপাঠের ভূমিকা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২৬০
সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শবরী। সরিৎশেখর মজুমদার ২৬১
ইংরেজের দেশে। অশোক ভট্টাচার্য ২৬২

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

উনি ভবিষ্যতকে মাপজোক করছেন সংখ্যা তথ্য দিয়ে

এখানে চার্ট, ওখানে গ্রাফ আর চারিদিকে সংখ্যা তথ্যের ছড়াছড়ি—তার মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন উনি! উনি হচ্ছেন মার্কেট রিসার্চ অভিজ্ঞ। আপনাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন, চাহিদা, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জীবনযাত্রা এইসব নিয়েই ওঁর কারবার—উনিই আমাদের আপনার ভবিষ্যত চাহিদা সম্বন্ধে জানান।

আমরা সবসময় আপনার পছন্দ অপছন্দ, মতামত ইত্যাদি সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করছি। এই মার্কেট রিসার্চের ফলেই আমরা আমাদের তৈরী জিনিষপত্রের উন্নতিসাধন করতে পারি। কাঁচা মাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারি বলে আমরা প্রয়োজনমত জিনিষপত্রের সরবরাহ চালু রাখতে পারি।

এই সব কারণেই হিন্দুস্থান লিভার আপনাদের মনোমত ভাল জিনিষ স্বল্প দামে দিতে সক্ষম।

দশের সেবায়
হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 14-X52 BG

উনিশশতকী জাগরণ এবং একটি বিতর্ক

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের যে কোনও প্রসঙ্গেই আমরা ভাববিগলিত হই, ইউরোপের রেনেসান্স এবং রিফর্মেশনের সঙ্গে তার সমার্থক তুলনা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করি না। চতুর্দশ শতক থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতার যে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে সম্ভবত দেশপ্রেমের উত্তেজনায়ই তা আমাদের মনে থাকে না। সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক বিচারপদ্ধতি নয়, এক ধরণের ঔচিত্যবোধই আমাদের সম্বল। তাই এদেশের অভিশপ্ত ঔপনিবেশিক জীবনের অদৃষ্টবিড়ম্বনা সহজে চোখে পড়ে না : যে যুগে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হয়, সেকালেই বাল্যবিবাহ কি বিবাহে স্বনির্বাচন সম্পর্কে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে বিতর্কের ঝড় ওঠে, এই সমস্ত 'অহিংস' সমাজসংস্কারের চেষ্টাও প্রতিপদে ব্যাহত হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীর ১৮০৮ এবং ১৮০৯ শকের কয়েকটি সংখ্যায় এই বাদবিসংবাদের কৌতূকপ্রদ বিবরণী পাই। বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অল্পবিস্তর পরিমাণে বিখ্যাত, সমাজের নেতৃস্থানীয়। তবু তাঁদের আলোচনার ভঙ্গী নিতান্তই স্থূল, গ্রাম্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রমাদে চাকরি জুটেছে, ভদ্র পরিচ্ছন্ন শহরে বাবু হওয়া গেছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত চৈতন্যের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি তার বহু নিদর্শনও লক্ষ্যণীয়।

শোভাবাজার রাজবাড়ীতে একবার বাল্যবিবাহের সমর্থনে সভা হয়। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বক্তা জয়গোবিন্দ সোম, চন্দ্রনাথ বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, অক্ষয়কুমার সরকার এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রথম বক্তা জয়গোবিন্দ সোম বলেন—'৭।৮ বৎসরের বালিকাও যে বিবাহের দায়িত্ব বুঝতে পারে ও ইচ্ছাপূর্বক সম্মতি দেয় তাহার প্রমাণ এই যে, বালিকা স্ত্রীরা বালকস্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয়।' অপূর্ব যুক্তি সন্দেহ নেই! কিন্তু তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। অল্প বয়সে প্রসব করতে গিয়ে মাতার স্বাস্থ্যহানি হয়, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে এই আপত্তি তিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেন : 'যদিও বালিকা মাতার অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণ নষ্ট হয় তাহাতে ক্ষতি কি?

কুলীরক মাতা যদি কুলীরক প্রসব করিয়া মরিতে পারে, আমাদের রমণীরাই বা কেন সন্তান প্রসব করিয়া অল্প বয়সে ও অকালে প্রাণত্যাগ না করিবেন?' একটি কুৎসিত প্রথার স্বপক্ষে এমন নির্লজ্জ অমানুষিক উক্তি উচ্চারণ করা বোধহয় আমাদের দেশেই সম্ভব। মনোমোহন বসুর বক্তব্যে প্রাচীন প্রথায় সরল বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই ঃ 'হস্তুকি খেগো বাকল পরা বুড়োরা যা করে গেছে, তার ভিতরে ভিতরে তাৎপর্য আছে; খপ্ করে তা মন্দ বলা আর তার বদল করা বড় ভুল। যে সব সংশোধন ও পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা কালে আপনা হতেই হবে।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও 'চিরপ্রচলিত দেশাচার সম্মত বাল্য বিবাহ প্রথা' উঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দেন।

এঁদের অন্ধ প্রথানুগামিতা তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে যুক্তিসংগতভাবেই নিন্দিত হয় ঃ 'অন্যান্য দেশে ও সমাজে শিক্ষিত লোকেরা উন্নতিশীল দলের অধিনায়ক হইয়া সকলপ্রকার উন্নতিসাধক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন; এখানে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার শিক্ষিত লেখকবৃন্দ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক; ইহাঁদের মত যে দেশের রীতি নীতি ভাল হউক বা না হউক, ঋষিরা প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না; এমনকি; সমালোচনা পর্যন্ত করিতে পারিবে না।'

শোভাবাজার রাজবাড়ীর সভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্বকৌমুদীর ১৮০৯ শকে ১লা ভাদ্র সংখ্যায়। ১লা আশ্বিনের সংখ্যায় দেখি, 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার গৃহে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের সমক্ষে' রবীন্দ্রনাথ হিন্দুবিবাহপ্রথা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। সভায় 'বিরুদ্ধ ও অনুকূল উভয় পক্ষই উপস্থিত ছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কে তত্ত্বকৌমুদীর এই সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ 'রবীন্দ্র বাবু এরূপ গবেষণা, ধীরতা, সদ্যুক্তি ও চিন্তাশীলতার সহিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি পক্ষ চন্দ্রনাথ বাবু (চন্দ্রনাথ বসু) পর্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই এবং সভাস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে হিন্দুবিবাহে কোনও আধ্যাত্মিক ভাব ছিল না।' বোধহয় রবীন্দ্রনাথের রচনানৈপুণ্যের মাহাত্ম্যেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাল্যবিবাহের দোষ স্বীকার করেছিলেন।

হিন্দু-বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'সাময়িক আলোচনা সভা'র বিতর্কও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সে যুগে উদার মানবিকতায়, সর্ববিধ সমাজসংস্কারে এই সমাজই ছিল পুরোবর্তী। তবু আলোচনাকারীদের অধিকাংশেরই বক্তব্যে কোনও পরিচ্ছন্ন যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার পরিচয় বিশেষ মেলে না। শোভাবাজার-সভার তুলনায় এঁদের আলোচনার মান অনেক উন্নত ছিল।

সমাজের সাময়িক আলোচনা-সভার এক অধিবেশনে 'বিবাহ ও পূর্বানুরাগ' সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন। তিনি বিবাহে নির্বাচনপ্রণালী, অর্থাৎ 'বর কন্যা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া পরস্পরকে স্বেচ্ছাক্রমে মনোনীত করা উচিত', এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর ভাষণকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় আলোচনার জের টেনে বলেন, নির্বাচন প্রথা থাকলেও অভিভাবকের মত গ্রহণ করা চাই। সীতানাথ নন্দীর মতে, বিবাহ সম্পর্কে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। পরবর্তী বক্তা হীরালাল হালদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেন ঃ 'সংসারের সকল কার্যেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় (design) দেখা যায়, প্রেমেতেও design আছে।' কিন্তু তারপরেই দেখি, তিনি ঈশ্বরের 'ডিজাইনে' সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন না, নশ্বর পিতামাতার কর্তৃত্বও বাঞ্ছনীয় মনে করেন ঃ 'বিবাহ বিষয়ে পিতামাতার হাত থাকা ভাল, কিন্তু কতদূর থাকা উচিত তাহা আমি চিন্তা করি নাই।'

তারিণীচরণ বসুর আলোচনায় শরীরতত্ত্বই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তিনি বলেন ঃ 'আমি নিজে এ সম্বন্ধে কোন মতামত এখন দিতেছি না কেবল অ্যানথ্রপলোজিক্যাল সোসাইটির একখানা কাগজ হইতে কিছু পাঠ করিব।' ইংরেজি পত্রিকাটি থেকে যে অংশ তিনি পাঠ করেন, তার সারমর্ম হল এই—বিবাহে স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্যবিবাহে অনেক সুফল দেখা যায়, যেমন 'বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, ললাট প্রসর' ইত্যাদি। হরকালী সেন এর প্রতিবাদ করেন ঃ 'বিবাহের উপর মানুষের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে, সেই জন্য হঠাৎ কোন এক Authorityর উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। বোষ্টন হইতে আগত জোসেফ কুক ঠিক তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করেন; তিনি আমাদিগের অধিকাংশকেই manikins (তালপাতার সিপাই) বলিয়াছিলেন। রূপজ বিবাহে (marriage by fascination) যদিও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহাতে সন্তানসন্ততি বলিষ্ঠ ও দৃঢ়ষ্ঠ হয়। বিবাহেতে শারীরিক উপযোগিতা আছে; অতএব আমাদের এ বিষয়টি বিশেষ চিন্তা করা উচিত।' জয়কৃষ্ণ মিত্রও বিবাহের শরীরতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবিত হন ঃ আমাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক; অনেকের হয়ত কোন ব্যারাম থাকিতে পারে অথচ তাঁহাদের বিবাহের ইচ্ছা আছে, এরূপ স্থলে কি করা কর্তব্য তাহা চিন্তার বিষয়।' তাঁর মতে, বিবাহে পিতামাতার কিছু কিছু হাত থাকা উচিত, তাহলে পাত্রকন্যা পরস্পরের উপযোগী হবে।

উমেশচন্দ্র দত্তের মত নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল ঃ 'অন্য কেবল পাশ্চাত্য ভাব দেখান হইল, কিন্তু হিন্দু দিক ভাল দেখান হইলনা। মনোনয়নের ভার অভিভাবকদের উপর কিন্তু মীমাংসার ভার বিবাহার্থীদের হাতে থাকা উচিত। একদিকে যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত, অপর দিকে তাহার সীমা থাকাও উচিত।'

পরের দিনের বক্তৃতায় উমেশচন্দ্র প্রাচীন প্রথার প্রতি তাঁর পক্ষপাত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন ঃ 'অনেকে বলেন নির্বাচন না হইলে মিল হয় না এবং সন্তানাদি ভাল হয় না। কিন্তু মিল যে কোথায় হয় না তাহা আমি জানি না। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা ৮০ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই বিবাহ প্রসূত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন লোক অতিশয় বিরল। বিবাহ সম্বন্ধে হয় অভিভাবকদের শাসন, না হয় সামাজিক শাসন, না হয় অন্য কোন শাসন থাকা উচিত, নতুবা স্বেচ্ছাচার আসিবে।' হয়ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত সুসন্তান লাভের পবিত্র মহৎ কামনায়ই সেযুগের বৃদ্ধেরা একাধিক বিবাহে উদ্যোগী হতেন!

কালীশংকর সুকুল 'নির্বাচনপ্রণালী'র অনুকূলেই মত দেন ঃ 'আমার মতে পূর্বানুরাগের উপর বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু এই পূর্বানুরাগের অর্থ চক্ষুরাগ নয়। চক্ষুরাগ হইয়া যে বিবাহ হয় তাহাতে অনেক কুফল ফলে।'

পূর্ববর্তী বক্তাদের তুলনায় শিবনাথ শাস্ত্রীর আলোচনা অনেক সংযত। তিনি বলেন প্রণয়ের মূলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। পরস্পরের সাম্নিধ্যে সকল দিক দিয়ে উন্নতি না ঘটলে বিবাহ করা উচিত নয়। সমাজে এধরণের বিবাহ প্রচলিত করতে হলে তরুণ তরুণীদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তাদের জীবনের আদর্শ উন্নত হয়, বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়, বৈরাগ্য ও ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস হয়।

স্ত্রী-পুরুষদের মেলামেশার সুযোগ না থাকলে যে স্বেচ্ছা-বিবাহ সম্ভব নয় শাস্ত্রীমশাই

তাও উল্লেখ করেন : 'যত দিন না পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরস্পরের সহিত ভাল করিয়া না মিশিতেছে ততদিন পছন্দ করিয়া বিবাহ হওয়া অসম্ভব।

আমরা মুখে অনেক স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশংসা করি বটে কিন্তু যথার্থ স্বাধীনতার পক্ষ এখনও অবলম্বন করি নাই।' উপযুক্ত শাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই তিনি এই মেলামেশার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন : 'আমাদের সমাজে পুরুষ স্ত্রীলোক একত্রে যাহাতে মিশিতে পারে তাহার পক্ষে এই আলোচনা সভা প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন, বক্তৃতাস্থলে আলোচনা ও সায়ংসমিতিতে সম্মিলন, মধ্যে মধ্যে উদ্যান সম্মিলন এই সমুদায় উপায়ে এই মেশামিশি হইতে পারে। আমাদের মহিলারা এবিষয়ে যদি আমাদিগকে সাহায্য করেন তাহা হইলে অনেক উপকার হয় এবং কার্যের সুবিধা হয়।' স্বর্ণপ্রভা বসু শিবনাথ শাস্ত্রীকে সমর্থন করেন : 'শাস্ত্রী মহাশয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মিশিবার যে উপায় বলিলেন তাহা অতি উত্তম। কথা অনেক হয়েছে এখন কাজে যাহাতে এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা হউক।

আনন্দ মোহন বসু বলেন, বিবাহে কিছুটা স্বাধীনতার সঙ্গে অভিভাবকদের অধীনতাও থাকবে, কারণ এখনও সমাজের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি। এই প্রসঙ্গে আনন্দমোহনের ভাষণের এই অংশটুকুও উল্লেখযোগ্য : 'যখন একটি আত্মা অন্য একটি আত্মার সহিত সংযুক্ত হয় তখন আমার মনে এক চমৎকার ভাব হয়। আমি বিবাহের মধ্যে ডিভাইন কেমেস্ট্রির কার্য দেখি। এমন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্য সমস্ত সমস্যাই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিনচন্দ্র পাল শাসনের ঔচিত্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর মতে সেটা হবে শুধু স্নেহের। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' শ্লোকটি উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র তীক্ষ্ণভঙ্গীতেই এর সমালোচনা করেন : 'এই শ্লোক সমাজের বাল্যাবস্থার কথা এবং বড় স্বার্থপরতার কথা, বিবাহেতে যেন কেবল পুরুষেরই স্বার্থ থাকিবে, নারীর কিছুই নাই। Fascination কথাটি সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন; আমার মতে যাহার যে ভাব প্রবল সে সেই ভাবেই চালিত হইবে এবং সেই ভাবে চালিত হইতে না দিলে কখনই ভাল হইবে না। আপাতত ব্রাহ্মসমাজে নির্বাচন নাই, কেবল Nomination করিয়া বিবাহ হয়; এরূপ বিবাহ ভাল নয়; ইহাতে পুরুষ ও স্ত্রীতে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করা হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলিব। একদা স্ত্রীবিদ্বেষী পণ্ডিত তাঁহার যুবক পুত্র সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুত্রটি একদল যুবতীকে দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, পিতা উহারা কে? পিতা বলিলেন these are geese পরে সেই পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে যখন সেই পিতা পুত্রকে কি উপহার দিবেন জিজ্ঞাসা করিলে, তখন সেই পুত্র বলিল 'Give me one of those geese father' স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক।'

আশ্চর্যের কথা, একজন বক্তা ছাড়া আর কেউ প্রশ্নটির সামাজিক তাৎপর্য তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি। একমাত্র বিষ্ণুপদ সেনের বক্তব্যেই সমস্যাটি যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে: বিবাহ বিষয়টা এত গুরুতর যে এখনও আমি এ সম্বন্ধে কোন শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। আমার বোধ হয় ক্রমে যত স্ত্রীশিক্ষা বাড়িবে, স্ত্রীলোকেরা যত আত্মপোষণক্ষম ও স্বাধীন হইতে শিখিবেন ততই বিবাহ বন্ধুতার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। এখন যে বিবাহ হয় তাহা কেবল স্ত্রীলোকের নিরাশ্রয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত।' 'উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পুরুষদের সংকীর্ণ চিন্তার মাঝখানে এই অখ্যাত ব্যক্তির স্বচ্ছ দৃষ্টি সত্যি প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম

রবীন্দ্রবিমুখতার যুগে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা! সংকোচ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রমানসকে কোন কাঠামে ধরা যায় না। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যে মানসসৃষ্টি অপূর্বতার বিস্ময় বহন করে চলে সীমাহীনতার পথে, তাকে কোন কাঠামে পুরে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়; তথাপি দেখি পুরণো বাহির্নিষ্ঠ অলংকার শাস্ত্রের মানদণ্ড নিয়ে, না হয় আধুনিক মতাদর্শের কালানুগ ঐতিহাসিক ছকে ফেলে রবীন্দ্রসহিত্য বিচারের চেষ্টা হয়। কি করে সম্ভব বুঝি না,

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপজ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে;
আজিও চলেছি তার টানে।

সারা রবীন্দ্রসাহিত্যে ও শিল্পে চিরন্তনী অধরার অন্বেষণ। পুলকাকুল বেদনা সচেতন চিত্তের স্পর্শ রয়েছে প্রতিটি বাক্‌বিন্যাসে, প্রতিটি শব্দযোজনায় প্রতিটি উপমা প্রয়োগে; রবীন্দ্রনাথের মানসদৃষ্টিতে অসীমের ছোয়া, রসাভিষিক্ত অপূর্বতার বিস্ময়।

ওগো দূরবাসী
কে শুনিতে চাও মোর চিরপ্রবাসের এই বাঁশি,—

বেদনার এই অন্তহীন স্রোতকে কোন কাঠামে ধরা কি সম্ভব? তাই বলছি রবীন্দ্রনাথকে কোন কাঠামের বেষ্টনীর মধ্যে আনা যেতে পারে না, তার সাহিত্যবিচারের জন্য নতুন অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন। বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাসের কাঠামেও রবীন্দ্রমানসকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। সে চেষ্টার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মানসিক স্থূলদৃষ্টির দৈন্য। ক্ষুদ্র দেহের আয়তনে বন্দীমনের দৃষ্টি স্বভাবতই স্থূল। ইন্দ্রিয়ের পথে বাহির বিশ্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধের সুরুতেই থাকে খণ্ডবস্তু। এই খণ্ড থেকেই সুরু হয় আমাদের জীবনের যাত্রা, আর আজীবন ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে বস্তুর সীমাতেই আমাদের যাত্রার হয় সমাপ্তি। অখণ্ড জীবনবোধ জীবনে সম্ভবই হয় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনানয়ন হয়েছে বিপরীত পথে। বিশ্ববোধ রবীন্দ্রনাথের সহজাত। কাঠাম চিরকাল তৈরী হয় স্থূলদৃষ্টির বিচারে। ইহা রবীন্দ্রবিমুখ চিন্তাধারা। তাই কোন লেখক এই পথে যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লোকশিক্ষক হয়ে ওঠেন, তখন তার অহমিকা হয়ে পড়ে বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। মার্কসীয় চিন্তায় সাহিত্য বিচারের যে প্রবর্তনা এসেছে, তাতেও মার্কস, এংগেলস লেনিনের বাস্তবপ্রগতিশীলতা রক্ষিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। মার্কসীয় চিন্তাকে একটা মতাদর্শের কাঠামের মধ্যে পুরবার চেষ্টায় রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্যে ও শিল্পের ক্রমবিকাশের পথে আজ সংকট উপস্থিত হয়েছে। ভাবীকালে সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের আশায় 'প্রলিটেরিয়েট্' প্রভুত্বে রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থা চলেছে, তাতে মার্কসীয় লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে বলে মনে হয় না। ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে চলেছে, অনিবার্য বিকাশের ধারা। এই পথেই এসেছে শোষণ নিরোধক মার্কসপ্রবর্তিত চিন্তাবিপ্লব ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনানয়ন। মার্কসকে এখানে ব্যক্তিহিসাবে দেখে ভুল করা হয়েছে। মার্কস নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তিকামনার বৈপ্লবিক প্রতীক। ব্যক্তি মার্কসের মতামতের সমকালীন

মূল্য থাকলেও তার কোন শাশ্বত মূল্য দেওয়া চলে না। মার্কসের মতামত এখন জড়বুদ্ধির শৃংখলে। দলগত নেতৃত্বের অনন্যতার অবগুণ্ঠনে সম্প্রতি আবির্ভূত হয়েছে যে মার্কসবাদ, তাতে রয়েছে এক স্থিতিশীল মনোবৃত্তি। ফলে রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে একদল 'ফ্যানাটিকস' সৃষ্ট হয়েছে তারা গড়ে পিটে সমাজের পরিবেশ বদ্‌লে দিয়ে মানুষকে নতুন করে সৃষ্টি করবে। এইজন্য সাহিত্য ও শিল্পানুশীলনের ক্ষেত্রেও তারা কাঠাম তৈরী করেছে। এইসময় কবি ও শিল্পীর বেদনা বন্দীশালার অভ্যন্তরে। একটা নিরুপায় ব্যর্থতার অন্ধকার সমাজমনের উপর নেমে এসেছে। আমরা বসে আছি এক প্রত্যাসন্ন ঝড়ের মুখে। আধুনিক বস্তুবাদের নামে এসেছে খণ্ডিত ব্যক্তিমনে যান্ত্রিক জড়বাদ। চিন্তার স্বাধীনতা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হতে চলেছে। শূন্যমনের আকাশে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জড়বাদ আসন পেতে বসার সুযোগ পেয়েছে। আত্মপ্রবঞ্চিত এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীর দল সমাজ মনের উপর বিস্তার করেছে ধর্মের মোহজাল। বহির্মুখীমন দেহসচেতন; এই দেহসচেতনতাই ধর্মব্যবসায়ীদের সম্বল। এতে লোভ ও লাভ দুইই সফল হয়। জড়বাদ প্রাচীন বা আধুনিক যে শ্রেণীরই হউক না কেন তাহা দেহানুগত কামের জনক। বর্তমান সমাজমনে ক্রমবর্ধমান ভোগস্পৃহা প্রবল হয়ে উঠেছে জড়বুধির ফলে। উর্বশী দেখা দিয়েছেন 'বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে'। রবীন্দ্র শিল্পায়নে রয়েছে কিন্তু প্রবহমান জীবনচেতনার মুক্ত রূপ। ডান হাতের সুধাপাত্রের বার্তা।

"সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিংকিণী।"

মার্কসের বস্তুবাদের মধ্যে ও বিকাশমান জীবন বাস্তব ইতিহাসের পথে চলেছে অব্যাহত গতি নিয়ে। মার্কসপন্থী বলে যারা দাবী করেন, তারাও দলগত শৃংখলার নামে শৃংখল গলায় পরেছেন এবং মার্কসের জীবননীতি ভুলে গিয়েছেন। দলগত নেতৃত্বের অনন্যতাকে আশ্রয় করে সমাজমন ও সাহিত্যের একাংশে তারা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করেছেন। এতেও জড়বুদ্ধি প্রশ্রয় পেয়েছে, তরুণ মন এই দলীয় কাঠামের মধ্যে বন্দী হয়ে স্বাধীনমানসগতিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই শ্রেণীর বহির্নিষ্ঠ স্থূলখণ্ড দৃষ্টির নিকট রবীন্দ্রমানসের প্রসন্ন প্রশান্তি ও সুদূরপিয়াসী নন্দনচেতনা হয় অর্থহীন না হয় দুর্বোধ্য। এখন দুঃসময় সন্দেহ নাই।

"এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।

সবে দেখা দিল অকুল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাংক বাঁকা।
ওরে বিহংগ ওরে বিহংগ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।"

বর্তমানের একখানি বাস্তবচিত্র। এখানে যে আশার বাণী রয়েছে তাহাই হউক রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের পাথেয়। গতিশীলতা হারিয়ে না গেলে মার্কসীয় বস্তুনিষ্ঠ জীবনায়নের কোন বিরোধ রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড জীবনবোধের সহিত থাকতে পারে না।

সংস্কৃতির নাকি রূপান্তর হয়েছে, হয়তো আমূল সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে। সে স্বপ্ন অনিবার্য ইতিহাসের পথে এখনো সার্থক হয় নাই, তবুও শিল্পসাহিত্য ও কবিতার সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে গেছে আধুনিক "মার্কসপন্থী" কবিদের নিকট। কবিতা এখন আর হৃদয়বেদ্য নহে, বুদ্ধিভেদ্য অভিনব অসংলগ্ন শব্দ বৈচিত্রের চমক, নতুন বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যায়াম। কথার ফাঁক পূরণ করতে হয় মাথার শিরা স্ফীত করে।

নতুন সমাজ পরিবেশ এখনও অনাগত, তবুও ভাবীকালের নতুন মানুষের কবিতা জন্ম নিতে সুরু করেছে। পরিবর্তিত সমাজ জীবনের প্রভাব যে নতুন সাহিত্য ও শিল্পের রূপ

মার্কস কল্পনা করেছিলেন, তা অকালেই জন্ম নিতেছে। এই অকালের শিশুদের নিয়ে সাহিত্যের অংগনে লালন পালনের অমানুষিক চেষ্টা চলেছে। এইসময় আমার নিকট রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সম্মুখে "সুচির শর্বরী ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে।" রবীন্দ্ররচনায় কবিতার যে রূপায়ণ হয়েছে তার উপলব্ধি আজও সম্ভব হয় নাই, আগামী দিনে তা হবে এ আশা রাখি। এইসময় নতুন সৃষ্টির উদ্যমকে নিরুৎসাহিত না করে ও প্রাক্‌রবীন্দ্র যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনে কবি ও কবিতার ধারণা কি ছিল ও রবীন্দ্ররচনায় তার কি রূপায়ণ হয়েছে, কি ভাবী সম্ভাবনা নিহিত আছে, তার একটু প্রাসংগিক আলোচনার প্রয়োজন মনে করি।

প্ল্যাটো বলেন Poet utter great and wise things which they themselves donot understand

কবিরা এমনসব মহৎজ্ঞানের কথা বলেন, যা তারা নিজেরাই বোঝেন না।" প্ল্যাটোর মতে কবি সত্যের বাহক। যে সত্য হৃদয়ের অতল অনুভবে লব্ধ, কবিতা তারই বাণীরূপ,—ইহাই ইয়ুরোপীয় অপর এক মনীষীর কথা "তুমি কবিতার মাধ্যমে সত্য লাভ করো, আমি সত্যের পথে কবিতায় পৌঁছি। কবিতা তুমি কোথাও পাবে না, নিজের যদি কিছু সম্বল না থাকে।" শেষোক্ত কথাগুলি জুবার্তের (Joubert)। এদের কথা, কবিতা কবির সহজাত। কবি কর্ণপুর তার 'অলংকার কৌস্তভ' গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রাক্তন না থাকলে কেহই কবি হতে পারেন না। কবির বাগনির্মিতিই কাব্য। একই ভাবের কথা বলেছেন শেফার। চমৎকার বাগ্‌বিন্যাস শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়, কথায়ই কবিতা থাকা চাই। জুবার্ত অরো স্পষ্ট করে বলেছেন "words become huminous when the poe t's finger has passed over them its phosphorescence." কথাগুলি ঝলমল করে ওঠে কবির করাংগুলির দ্যুতি যখন তা স্পর্শ করে। কবিতা এদের মতে অপার্থিব সৃষ্টি। কর্ণপুর এজন্যেই বলেছেন কবিতারচনার মধ্যে রয়েছে কবির প্রাক্তন সঞ্চয়। কবির মানসদ্যুতিই হচ্ছে তার প্রাক্তন, যে দ্যুতি নিয়ে হয়েছে কবির আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই প্রাক্তনের স্বীকৃতি আছে কি? আছে, এই স্বীকৃতি নিহিত আছে উপনিষদের ঋষিমানসে, করুণাঘন তথাগতের হৃদয়বোধে, বৈষ্ণব বাউলের বিরহাতুর হৃদয়ের চিরায়মান আকুতির মধ্যে। এই ভারতীয় সংস্কৃতির বহুস্রোতের ধারা এক হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে। বাউল কবি সাধক গেয়েছেন,

ওরে ও নিঠুর দরদী
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুণে

এই নিঠুর দরদীই রবীন্দ্রমানসে দেখা দিয়েছেন জীবনদেবতা ও অন্তর্যামী রূপে। 'চিত্রা'র রচনাকালে কবির এই আত্মদর্শন;

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

পাশ্চাত্যমনেও ইহার অন্ততঃ কিছুটা উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়,

Poetry it itself a thing of God—He made his prophets poets; and the more we feel of paesy do we become like God in love and power (Baiby)

"কবিতা দৈবী সম্পদ; দেবতা তার বাণীবাহকদেরই কবি করে পাঠিয়েছেন। কাব্যোপলব্ধি নিবিড়তর হলেই প্রেমে ও বীর্যে আমরা ভগবানের অনুরূপ হয়ে যাই।"

'জীবনদেবতা'র ছত্রে ছত্রে প্রেমিক কবির এই আত্মনিবেদন,

"লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজনবাসে।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজীবন বোধের বাণীবাহক। প্রথম বয়সের রচনায় রবীন্দ্রনাথের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হলেও বালক কবির অনুভূতির সর্বত্রগামিতার লক্ষণ শৈশবের কবিতায়ও অস্পষ্ট নহে। শৈশবের কবিমানসে বৃহতের অনুভূতি স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছে। স্থূলবস্তুর চেয়ে প্রাকৃতিক ও রূপবৈচিত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশের যে আকর্ষণ রয়েছে, তাহাই কবিমনকে নিয়ে যায় সুদূরের পথে। শৈশবসংগীতে এই কল্পনালীলার পরিচয় আছে। পরিচয় আছে কবির কিশোর বয়সের গাঁথা কবিতাগুলিতে। সুদূরের ইঙ্গিত স্পষ্টই রয়েছে "অতীত ও ভবিষ্যৎ" কবিতাটিতে।

"নিশীথে নদীর পরে ঘুমিয়েছে ছায়া চাঁদ,
সাড়াশব্দ নাই চারিপাশে,
একটি দুরন্ত ঢেউ জাগেনি নদীর কোলে
পাতাটিও নড়েনি বাতাসে,
তখন যেমন ধীরে দূর হতে দূরপ্রান্তে
নাবিকের বাঁশরীর গান
ধরি ধরি করি সুর ধরিতে না পারে মন
উদাসিয়া ওঠে যেন প্রাণ।
কি যেন হারানধন কোথাও না পাই খুঁজে
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে
বিস্মৃতি, স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে
অবিস্মৃতি জাগাইয়া তুলে।" (অতীত ও ভবিষ্যৎ)*

আলোছায়ার অনিশ্চয়তার মধ্যে কবিমন খুঁজে পায় দূর অনন্তের স্পর্শ, খুঁজে তার স্বরূপ। ইহা রবীন্দ্রমানসের স্ব-স্ব। এই "অতীত ও ভবিষ্যৎ" কবিতায়ই পাই সোনারতরীর নিরুদ্দেশ-যাত্রার পূর্বাভাস,

যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছি জীর্ণ তরী
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীলতট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি
সেদিকে ফিরায়ে আঁখি এখনো দেখিতে পাই
ছায়া ছায়া কাননের রেখা
নানাবরণের মেঘ মিশেছে বনের শিরে
এখনো বুঝিরে যায় দেখা
যেতেছি যেখানে ভাসি সেদিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে
কোথাও না দেখি তার শেষ।"

রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশধারায় প্রাক্তনের অন্বেষণ সুরু করতে হয় কবির শৈশবস্বপ্নে—তাঁর কিশোর বয়সের রচনায়। এ ছাড়া রবীন্দ্রমানসের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন কবির সহিতই রবীন্দ্রমানসের তুলনা চলে না। তুলনা চলে না এইজন্য—রবীন্দ্রনাথ যে অনুভূতি দিয়ে জাগতিক জীবনকে স্পর্শ করেছেন তা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব—অনন্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট বাহিরবিশ্ব অন্তর্জগতের সম্প্রসারিত বাস্তবরূপ।

"বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথা ভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে
সেই মোহমন্ত্রগানে কবির গভীর প্রাণে—
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা
ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।"

বাহিরের সঙ্গীহারা সৌন্দর্য সম্ভারকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন তাঁর মর্মলোকে, আশা ভাষা ও ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছেন মানসী প্রতিমা। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের

* শৈশবসংগীত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, আদি সমাজ শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯১

কবিমানস এক পরমবিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড জীবনবোধের কবি। দেশ ও কালের অতীত এক অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে নিজের হৃদয়বেদনা দিয়ে স্পর্শ করেছেন। খণ্ড বস্তু থেকে যাত্রা সুরু করলে, আমার মতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে পৌঁছা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র মন সীমার বন্ধনে আটকা পড়ে, দৃষ্টিবিভ্রম হয়। বিরাট অসীমতার অনুভূতি আমাদের মানস-স্পর্শের অতীত থেকে যায়। অসীমতার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের সহজাত প্রাক্তন। ইহাই রবীন্দ্রমানসের পটভূমিকা; এখানেই বাহির বিশ্বের গন্ধ, গান দৃশ্য আপনার ঐক্য, আপনার বস্তুভারহীন মূর্তরূপের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে। সমুদ্র যেমন নদীকে বুকে টেনে নেয়, তেমনি সংবেদনশীল কবিমানস সব কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ড বস্তুকে, ধূলিকণাকে পর্যন্ত মুক্তি দিয়েছে অখণ্ড অনন্তের কোলে। প্রত্যেকটি বস্তুসত্তার, প্রাণময় মনোময় জগতের প্রতিটি দুঃখ বেদনার স্পন্দনের সহিত একাগ্রতা অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যে রবীন্দ্রমানসের যে পরিচয় রয়েছে, তা সমাজ, দেশ ও কালের অতীত। এখানে আমি দেখি সকল সমকালীন ইতিহাসের সর্বকালীন রূপ। স্থূলদৃষ্টি ও খণ্ডবস্তুর সংঘাত দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য বিচার চলে না। রবীন্দ্রমানস বস্তুবাদী দর্শনের শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসকে অতিক্রম করে প্রসারিত হয়েছে পল্লীচেতনার, মানুষের দুঃখবেদনার, বিশ্বপ্রকৃতির, সর্বত্র। এর অস্ফুট লক্ষণ রয়েছে শৈশবের রচনায় অর্ধস্ফুট রূপ আছে সন্ধ্যাসংগীতে এবং স্পষ্ট হয়েই দেখা দিয়েছে প্রভাত সংগীতে,

"হৃদয় আজিকে মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।"

প্রসংগত এখানে একটি আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়লো। রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনা থেকেই তাঁর প্রাক্তনের অন্বেষণ সুরু আমরা করবো। তার আগে সীমা ও অসীমের যে "দ্বন্দ্ব" রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো কোনো সমালোচক কল্পনা করেছেন, তার কোনো ভিত্তি আছে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। কেননা সমালোচকের সীমার দৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের মনের সম্মুখে অনেক ক্ষেত্রে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে; এতে আধুনিক যুবসমাজের একাংশে রবীন্দ্রবিমুখতা প্রশ্রয় পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির অতল রসলোকের পথ, তাই মনে হয়, তা, তাদের নিকট যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এদের নিকট এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের গান ও নৃত্যনাট্যগুলি তরল আমোদ-প্রমোদের অবলম্বন হয়ে পড়েছে। ইহা রবীন্দ্রশিল্পের এক অসহনীয় বিড়ম্বনা।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচক। তার "রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহের" প্রস্তাবনায় লিখেছেন, "একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে 'সীমার মধ্যেই অসীমের' মিলনসাধনের পালা তাঁহার সমস্ত রচনায় মূলগত ভিত্তি হইলেও রবীন্দ্রসাহিত্যে সীমা ও অসীমের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে—ইহা ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের লীলাই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ, যদি এই দুয়ের সমন্বয় ঘটিয়া থাকে তবে, তাহা উপরি লাভ। আমার নিজের ধারণা—রবীন্দ্রসাহিত্যে এই দুয়ের সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়া ওঠে নাই, আর ঘটিয়া ওঠে নাই বলিয়াই একপ্রকার অশান্তি তাঁহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এই আত্মিক অশান্তিই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার বীণাকে ঝঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বের অবসান কি ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা সাহিত্য সমালোচকের এলাকা বহির্ভূত, এই দুইয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অনুসরণই সমালোচকের কর্তব্য—রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহে তাহাই করিবার চেষ্টা হইয়াছে।"

২

প্রমথবাবু রবীন্দ্র রচনায় সীমা ও অসীমের যে দ্বন্দ্বের লীলা লক্ষ্য করেছেন এ যাকে ভিত্তি করে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর তিনি তিনচারখানা গ্রন্থ লিখেছেন, সেই দ্ব আমি ধরতে পারি নাই। প্রমথবাবুর সহিত আমার মতভেদ মৌলিক। তাই এই বিষয় নি কিছু আলোচনা করতে চাই।

নদীর সহিত সমুদ্রের যেমন কোন দ্বন্দ্ব নাই, তেমনি সীমা ও অসীমের মধ্যেও কো দ্বন্দ্ব কল্পিত হতে পারে না। দ্বন্দ্ব থাকতে পারে খণ্ডবস্তুর মধ্যে, কিন্তু অখণ্ডের সা খণ্ডের কোন বিরোধ সংঘাত বা দ্বন্দ্ব দার্শনিক চিন্তায় স্বীকৃত নহে। রবীন্দ্রমানসে এ কোন দ্বন্দ্ব যে নাই তার অজস্র প্রমাণ রবীন্দ্ররচনায় রয়েছে। খণ্ডের দ্বন্দ্ব জড়বস্তু ও স্থ দৃষ্টির মধ্যে, জাগতিক জীবনের সীমায়। সেই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে নাটকে ও কবিতা বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে অখণ্ড জীবনবোধের পথে মানুষের মর্মতলের অন্তহীন বেদনা মুক্ত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্ররচনার রসসৃষ্টির মূলে সীমা ও অসীমের ঐক্যবোধ, দ্বন্দ্ব ন

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

সীমার দৃষ্টি স্থূলের দৃষ্টি; এই স্থূলের ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত। বিভিন্ন গল্পলেখ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক এই সংঘাতকে আশ্রয় করে রসসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, নিজেদে জীবনদর্শন দিয়ে হয় তার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, না হয় এমনিই চলমান জীবনের চি রূপ এঁকে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট শিল্পায়ণের পটভূমিকা অসীম অন্তহীন জীব প্রবাহ। পৃথিবীর দিকে নয় শুধু সমগ্র জগতের দিকেই তিনি চেয়েছেন সৌরপথের পথি রূপে, দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে স্থান গ্রহণ করে।

বিশ্বমানস ও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের মধ্যে একটি অবিভাজ্য ঐক্যবোধ রয়ে রবীন্দ্রমানসে দেখি ত্রিকালের যুগপৎ অনুভূতি। বিশ্বজীবনপ্রবাহ ও বিশ্বসত্তাকে রবীন্দ্রনা অখণ্ড সমগ্রতায় গ্রহণ করেছেন। এই একাত্মতাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাভূমি। উপনিষদে ঋষিপ্রজ্ঞা জ্ঞানের পথে যে একাত্মতা উপলব্ধি করেছে, রবীন্দ্রনাথ তা পেয়েছেন রসের পথে এই প্রাক্তন নিয়েই রবীন্দ্রমানসের আবির্ভাব। ইহা দ্বন্দ্ব নহে, দ্বন্দ্বাতীত সত্যের উপলব্ধি 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'—স্থূলদৃষ্টির মধ্যেই আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্র মানস স্থূলজগতের দেহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; সুদূর আকাশের পাখী যেমন খাঁচার বন্ধ বাঁধা পড়ে; কিন্তু দূর আকাশই যে তার মুক্তির অঙ্গন, এ কথা সে ভুলে না। রবীন্দ্ররচনা সর্বত্র এই অনুভূতি ও উপলব্ধির সঞ্চরণ। স্থূলের দ্বন্দ্বকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তাহার সহজাত জীবনবোধের জন্যই অসীম অরূপের কোলে, এই দ্বন্দ্বম বিভ্রান্তির সমাধান তিনি করেছেন।

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধু পান
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।"

রবীন্দ্রনাথ স্থূলবস্তুকে স্থূলদৃষ্টির দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেননি। বাস্তবজীবনকে রবীন্দ্র নাথ গ্রহণ করে, তাকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন অসীমের পটভূমিকায়, তার নিজের জীবনে উপলব্ধিতে কোন দ্বন্দ্ব নাই; রসের পথে রবীন্দ্রজীবনে সকল স্থূলের দ্বন্দ্বেরই সমাধান হয়েছে। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই রবীন্দ্র শিল্পসৃষ্টির মূলসুর। রবীন্দ্রনাথের নিকট "রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী।" রবীন্দ্রনাথের কবিমানস ক্ষুদ্রকে দেখেছে বৃহতে কোলে। ধূলিকণাও "বিশ্বচরণ বিলীনা"। দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের নিকট আলো-আঁধারের বিভ্রম মা

আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারা প্রাচীর বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতনপ্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে।

এখানে সীমার সহিত অসীমের দ্বন্দ্ব নহে। স্থূলের দ্বন্দ্বের সমাধানে সীমার সহিত অসীমের চিরন্তরযোগের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলছেন "সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা" তার রচনার মূলসুর, সেখানে প্রথম বিশী মহাশয় দেখলেন মিল নহে দ্বন্দ্ব। মাঝে মাঝে তাহার মতে কিছু উপরিলাভ হলেও হতে পারে, তবে সীমা অসীমের দ্বন্দ্বই রবীন্দ্ররচনার মূল কথা, ইহাই বিশী মহাশয়ের স্পষ্ট অভিমত। নিঃসংকোচে স্বীকার করছি, আমি রবীন্দ্ররচনায় এই দ্বন্দ্বের অন্বেষণ করে খুঁজে পাইনি, পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বেদনার স্পর্শে রসাভিষিক্ত উপনিষদের ঋষিযুগের সাধনলব্ধ উপলব্ধির এক অনুপম শিল্পরূপ।

ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্র বেদীর তলে আমি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

"সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণ তমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি। (১৬ ঈশোপনিষৎ)

প্রমথবাবু আরো বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ দুইয়ে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই একপ্রকার অশান্তি তাহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল, এই আত্মিক অশান্তিই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাহার বীণাকে ঝংকৃত করিয়া রাখিয়াছিল।" এই উক্তিটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই দ্বিতীয়বার ইহা উদ্ধৃত করছি।

সৃষ্টির মর্মমূলে প্রকাশের যে বেদনা—যা এই বিরাট জীবনপ্রবাহকে অনবরত গতিশীল করে রেখেছে, রবীন্দ্রনাথ যার সামগ্রিক রূপটি অনুভব করেছেন তার বহু কবিতায়, বহু রচনায়, বিশেষভাবে 'বলাকা'র 'চঞ্চলা' 'বলকা' প্রভৃতি কবিতায়, তাকেই "অশান্তি" বলে অভিহিত করেছেন বিশী মহাশয়। ইহা অশান্তি নহে, বেদনার স্পর্শচেতন আনন্দিতচিত্তের প্রসন্ন প্রশান্তি:

'ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবন মেখলা

এই যে প্রসারিত কবিচিত্তের সর্বময় আত্মোপলব্ধির, ইহা কি অশান্তি না প্রশান্তি। এখানে যে আনন্দের আবেগ ও উচ্ছ্বাস রয়েছে তা 'বলাকা' কবিতায় অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে, ক্রমশঃ ইহাতে পূরবীর সুর লেগেছে, 'আকাশ প্রদীপে' দৃশ্যমান জগৎ প্রায় অবলুপ্ত।

বস্তুর ইন্দ্রজাল রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে কখনো মলিন করতে পারেনি; এইটুকু যদি আমরা লক্ষ্য করি, তা' হলে রবীন্দ্রকাব্য মন্দিরের দ্বার আমাদের কাছে রুদ্ধই থেকে যাবে।

Matter বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়কে শ্রীঅরবিন্দ আত্মার Mutable garb রূপান্তর-ধর্মী আবরণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 'চঞ্চলা' কবিতার প্রকাশের মধ্যে যেখানে "মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে" এই তথ্যটিই নিহিত রয়েছে। 'আরোগ্য' ও 'রোগশয্যায়' যে সকল কবিতা স্থান পেয়েছে তাতে ইহজগতের সীমা অতিক্রমের আসন্ন সম্ভাবনার মুখে কবিচিত্তের যে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা তাহা কি প্রমথবাবুর ন্যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচকের নিকট শুধু রবীন্দ্রজীবনের অশান্তির বার্তাই বহন করলো। বিস্মিত হয়েছি বৈকি।

দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যা স্নান
যেথায় ক্ষেত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি,
চৈতন্যসাগর——তীর্থপথে—

এইপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষবেলার রচনা হতে অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া চলে। 'এই মহাবিশ্বতলে, যন্ত্রণার যে ঘূর্ণযন্ত্র চলে' রবীন্দ্রনাথের মনঃসীমানায় তার স্বরূপ ধরা পড়েছে; কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তিকে বিচলিত করতে পারেনি, যদিও

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা,

এই বীর্যের সম্পদ রবীন্দ্রনাথের নিকট অপরাজেয় অপরিমেয়, মানুষের জয়যাত্রা চলেছে "ধূলি-শয্যা মাড়ইয়া দলে দলে দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে" প্রেম হচ্ছে তার পাথেয়। অপরিমেয় প্রেমে দুঃখজয়ের মহাকাব্য এই রবীন্দ্র জীবন। উপনিষদের ঋষিচিত্ত তার জ্যোতির্ময় মহিমা নিয়ে রবীন্দ্রমানসে প্রতিফলিত। এই একাত্ম উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন।

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ অমৃত রূপ বিশ্বের প্রকাশ।

ক্ষুদ্রসীমার দ্বন্দ্ব যে মহানকে খর্ব করে, সমালোচকের এই স্থূলদৃষ্টির স্বভাব ও প্রকৃতি তার অজ্ঞাত থাকার কথা নয়,

"ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানের খর্ব করা সহজ পটুতা"

এই সহজ পটুতাকে রবীন্দ্রনাথ কৃপার চক্ষেই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি ও জীবনদর্শনে

যে দেখে অখণ্ডরূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।

তার কবিমানস যে সর্বস্পন্দের অতীত আদি অন্তহীন বিরাট বিশ্বমানস তাতে কারো কোন সন্দেহ হওয়ার অবকাশ রাখেননি রবীন্দ্রনাথ,

"যে চৈতন্য জ্যোতি
প্রদীপ্ত হয়েছে মোর অন্তর গগনে
নহে আকস্মিক বন্দীপ্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়

'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থটিতে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে তা এ জগতের সীমা অতিক্রমের পূর্বে

প্রায় পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে লেখা। এখানেও কবিচিত্তের নির্মল প্রশান্তি যা শেষ লেখার শেষ কবিতাটিতে অব্যাহত রয়েছে।

'একা বসে সংসারের প্রান্ত জানালায় —
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা

রবীন্দ্রজীবনে সীমা অসীমের দ্বন্দ্ব কল্পনা করে যে 'আত্মিক অশান্তি' অনুমিত হয়েছে তা সীমা অসীমের দ্বন্দ্বজনিত অশান্তি নহে, তা বিশ্বজীবন প্রবাহের অনিঃশেষ অনির্বাণ প্রকাশের বেদনা। বিকাশের ও এই সৃষ্টি বেদনার (creative urge) স্বীকৃতি আছে। নৃতত্ত্ববিদেরা ইহাকে noble push বলে অভিহিত করেছেন। ইহা উপনিষদের "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" বীজের অন্তর্নিহিত অংকুরের প্রকাশ স্বভাবতই বীজের আবরণ উদ্ভিন্ন করে হয়ে থাকে; এখানে দ্বন্দ্বের বিভ্রম সৃষ্টি করলে মন স্থূলদৃষ্টির নিকট বন্দী হয়ে পড়ে; এতে রবীন্দ্ররচনার মুক্ত অংগন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ইহাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে উল্লেখ করেছেন। জীবন প্রবাহের মর্মতলে এই শাশ্বত বেদনা রবীন্দ্রজীবনে সার্থক হয়েছে তার কবিমানসীকে অবলম্বন করে। বলেছি উপনিষদে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তনের সূচনা। উপনিষদে এই কবিমানসীর বিরাট রূপের উপলব্ধিও আছে। জীবনদেবতা ও অন্তর্যামী এই পুরুষ ও নারীর দুই রূপ উপনিষদেও এক হয়ে আছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে এই উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন "ইন্দ্রো হ বৈ নাম্নেষ যো হয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষ" এই যিনি দক্ষিণচক্ষে অবস্থিত পুরুষ ইহার নাম ইন্দ্র"—ইন্দ্র শব্দের অর্থ দীপ্তিময় জ্যোতির্ময়। এখানে অক্ষিপুরুষের কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলে যাচ্ছেন—

"আর বামচক্ষে এই যে পুরুষাকার, ইনি ইহার পত্নী বিরাট। হৃদয়পদ্মের মধ্যে এই যে আকাশ, ইহা তাঁহাদের মিলনভূমি ইত্যাদি (স্বামী গম্ভীরানন্দের সম্পাদিত বৃহদারণ্য কোপনিষদ) এখানে জ্ঞানবাদী ঋষিরা প্রকাশিত বিশ্বকে বৈশ্বানর বা জ্যোতির্ময় সত্তারূপে বর্ণনা করেছেন। এই যুগলরূপ মূলত এক। আমাদের প্রয়োজনের জন্য এই বৈশ্বানর বা জগদাত্মার এই প্রথমপাদই যথেষ্ট এবং এখানে রবীন্দ্রনাথের সর্বমঙ্গলী 'মানসী' 'লীলাসঙ্গিনী' ও জ্যোতির্ময়ীর যে উপলব্ধি কবিশিল্প তাঁর বেদনাবিধুর অন্তর দিয়ে লাভ করেছেন, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের প্রমুক্ত অন্তরাকাশ আলোকিত করে আছেন তার বিশ্ববেদনার অধিষ্ঠাত্রী অন্তর্যামী মানস সুন্দরী—

'অচল আলোকে রয়েছে দাঁড়ায়ে
কিরণ বসন অংগে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভংগে,

গন্ধ তোমার ঘিরি চারিধার
উড়িছে আকুল কুন্তলভার
নিখিল গগন কাঁদিছে তোমার
পরশ রস তরংগে

চৈতালীর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ধ্যানদৃষ্টিতে উপনিষদের এই বিরাটকেই উপলব্ধি করেছেন।

আজি এ বসন্তদিনে বিকশিতমন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন

যেন শূন্য আছে এক মহাপারাবার;
যেন এ জগৎ নাহি কিছু নাহি আর

এই বিরাট মানসীর সঞ্চরমানারূপ রবীন্দ্ররচনার সর্বত্র সুরে ও ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে।

তুমি পড়িতেছ হেসে তরণীর মত এসে
হৃদয়ে আমার
যৌবন সমুদ্র মাঝে কোন পূর্ণিমায় তাজি
এসেছে জোয়ার

স্বল্পাতীত এক উপলব্ধির মধ্যে জীবন জোয়ারের উপলব্ধি রয়েছে রবীন্দ্র জীবন মহাকাব্যে।

চেনা অচেনার মাঝখানে ইনি কবির লীলাসঙ্গিনী। সন্ধ্যাসংগীতে কবিচিত্তের বেদনা ইহাকে যে খুঁজেছে এমন নহে, এই বেদনাই মূর্তিমতী হয়ে ধরা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে। এই মনোময়ীর নিকট আত্মদানের ফলেই সম্ভব হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট শিল্পায়ন।

তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
গাইনু দেখিতে (সন্ধ্যাসংগীত)

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের উৎস হতে। (মানসী)

সোনার তরীতে ইনি কবির জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবির প্রাণযাত্রার দিশারী অপরিচিতা সুন্দরী। 'চৈতালী'তেও কবিমানসী কবির মানসলোকের দীপান্বিতার পুরোভাগে

"তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তার পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে"

ইহার স্পর্শেই

মুগ্ধ তনু মরি যায় অন্তর কেবল
অংগের সীমান্তপ্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে (সোনার তরী)

এই কবি মানসীর "স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর স্বচ্ছনীলাম্বর সম।" ইনি মানসী রূপিনী, বাসনা-বাসিনী, আলোক বসনা নীরবভাষিণী। অন্তহীনা কবিমানসীর যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা সোনার তরীর মানসসুন্দরী কবিতায় রয়েছে, তাতে এইটুকুই মনে হয় বিশ্বজীবনের সৃষ্টিশক্তিকে (creative force) রসের সঞ্চারিনী রূপে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ আর্থিক জীবনের উপলব্ধির মধ্যে

"তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত;
সংগীত তরংগধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবন ব্যাপী থর থর করি।"

রবীন্দ্র মানসী বিশ্বমানসের সর্বময়ী। অন্তরে বাহিরে, রূপে অরূপে কবিজীবনকে ইনি পরিপূর্ণ করে রেখেছেন,

'ধূপ গন্ধ হয়ে গেছে গন্ধ বাষ্পতার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারিধার।
গৃহের বণিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতা রূপে হয়েছে উদয়—'

এখানেও রবীন্দ্রজীবনে সীমা ও অসীমের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কবিমানসী অসীমের কোলে

অপরিচিতা হয়ে যান। নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবির মনতরীর কর্ণধার অপরিচিত। চিত্রায় মানসী কবিজীবনের অন্তর্যামীরূপে দেখা দিয়েছেন। কবির সকল সৃষ্টির মূলেই মানসী অন্তর্যামী রূপে "কৌতুকময়ী"।

অন্তর মাঝে তুমি বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কাড়ি লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে'

রবীন্দ্রজীবনে মানসীর নিকট সর্বসমর্পণে যে সৃষ্টি তা কবির ব্যক্তিসত্তা তা নিজের বলে দাবী করে না। রবীন্দ্ররচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি তথ্য মাত্র নহে, তার একটা তত্ত্বগত দিক আছে। কবির এক অপূর্ব উপলব্ধি —

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ অপার বাসনা
কিসের লাগিয়া বিশ্ব বেদনা
মোর বেদনায় বাজে।

সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো এক বিশেষ দেশের এক বিশিষ্ট কবিরূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখা সম্ভব নহে। মূর্তিমতী বিশ্ববেদনা রবীন্দ্রমানসকে গ্রহণ করে রবীন্দ্র-জীবনকে জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি প্রবাহে পরিণত করেছে। এই জীবন প্রবাহে দেশ-কালের জন্মমৃত্যুর সীমা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের জীবন মহাকাব্য। এর প্রমাণ সমগ্র রচনায় ছড়ানো রয়েছে। এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের শৈশব রচনা থেকে সুরু শেষ লেখা পর্যন্ত সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির উপলব্ধি আমি সম্ভব বলে মনে করি।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

বাখ্-এর সুরসংগীত ও মার্থ

একদিন দুপুর বেলা, একাদেমীর কাজ শেষ করে আমি ও মার্থ বসলাম গিয়ে লুক্সাম্বুর্গ উদ্যানে। সেখানে যাবার পথে ন' ইঞ্চি তার তিন' বুটির মাঝখানে হ্যাম্ভরা বড় স্যান্ডুইচ কিনে নিয়েছিলাম মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে। আমি স্যান্ডুইচ খেয়ে যাচ্ছি আর মার্থ বলে চলেছে বাখ্-এর কথা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সংগীত নায়ক বাখ্-এর জীবন চরিতে উপন্যাসের মতো অসামান্য বা চমক দেওয়া কোন ঘটনা ভরা ছিল না। বাখ্-এর পাঁচ বংশ চর্চা করে গিয়েছিলেন সংগীত। ছোট বেলায় বাপ-মা হারিয়ে অষ্টম সন্তান জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোয়ান ক্রিষ্টফ্-এর কাছে মানুষ হয়েছিলেন এবং তারই কাছে হয়েছিল তাঁর সংগীতের বর্ণপরিচয় শিক্ষা। সংগীত শিক্ষায় অদম্য অনুরাগ সুরু হয়েছিল তাঁর বাল্য থেকেই। যেখান থেকে সম্ভব তিনি সংগ্রহ করতেন সংগীতের স্বরলিপি। তাঁর ভ্রাতার সযত্নে তালায় বন্ধ রাখা সংগীতের স্বরলিপি, তিনি রাত্তিরে কৌশলে চাবি খুলে নকল করে, সকলের অগোচরে কাবার্ডে যেমন রাখা ছিল, আবার তেমনি রেখে দিতেন এবং বহু মাসের অধ্যবসায় সহকারে সেই স্বরলিপির সবটাই ঐ গুপ্তভাবে নকল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনকার সংগীত নায়কদের বাদ্যবাদন শুনবার জন্য তিনি পদব্রজে চলে যেতেন বহু ক্রোশ দূরের শহরে ও গ্রামে। একবার হ্যাম্বুর্গে বিখ্যাত সুরশিল্পী রেইন্কেন্ সেন্ট ক্যাথারিন গীর্জায় অর্গান বাজাচ্ছেন শুনে তিনি পদব্রজে গেলেন তিরিশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে। পথে ক্ষুধায় কাতর তিনি এক হোটেলের সামনে পদস্বয়কে বিশ্রাম দিতে বসলেন। হঠাৎ উপরের এক জানলা খুলে, হয়তো তাঁকে ক্ষুধার্ত দেখায়, কে ফেলে দিল তাঁর সামনে দুটি মাছের মুড়ো। অনিভ্যমানী বাখ্ মুড়ো দুটো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে গিয়ে বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে প্রতিটি মুড়োর মধ্যে ছিল একটি করে স্বর্ণমুদ্রা।

বাখ্-এর সংগীত জীবন সুরু হয়, গির্জার কোয়ার্ গীতকারী কিশোরদের একজন গায়ক হিসাবে। তাই তাঁর রচিত গির্জার হিম্ টিউন ভরা কোরাল 'পারতি'তাতে যে স্তোত্র গীতের পবিত্রতা ও মূর্চ্ছনা অনুভব করা যায় তা অন্য কোন সংগীত রচয়িতার রচনায় উপলব্ধ হয় না। পরে কৈশোর শেষে যৌবনের প্রারম্ভে যখন বাখ্-এর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হল তখন তাকে কোয়ার ছেড়ে খুঁজতে হল অন্যপথ। তখনকার যুগে ইউরোপে ছোট বড় ডিউক ও প্রিন্সের ছড়াছড়ি। তাঁদের দরবারে তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করতে নিযুক্ত হত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক-গায়িকা, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতার দল। বাখ্-এ ভাগ্যক্রমে নিযুক্ত হলেন "ভেইমারের" একটি গির্জার অর্গানিস্ট ও কোয়ার মাস্টার। বাখ-এর অর্গানের প্রতি একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল। কান্তাতা টোকাতা ও ফিউগ ধরণের যে প্রায় তিনশত রচনা জগতকে তিনি দিয়েছেন, তার সুরু ঐ গির্জার অর্গানের সুযোগ পাওয়া থেকেই। তখনকার দিনের শাসকদের সমাজে দরবারী কবি, সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান বাটলার ও সহিসদের সমান ছিল। তাঁদেরও পরতে হত চাকরের উর্দি।

স্বাধীন-চেতা বাখ্, তাদের এই বিনয়হীনতা ও ধৃষ্টতায় অনেক মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

তিনি ক্রমে ভেইমার ছেড়ে ক্যাতুল্-এর শাসকদের দরবারে হাজির হন। এইখানে অবস্থানকালে বাখ্ রচনা করেন কয়েকটি অপূর্ব অর্কেস্ট্রাল সংগীত ও ভায়োলিন্ কন্চারতো। বাখ্-এর চিরকালের অভ্যাস নানা সহরে গ্রামে সংগীতবেত্তা ও সংগীত-রচয়িতার সন্ধানে ভ্রমণ। এমনি এক যাত্রার পথে পরিচয় হল ব্রান্ডেনবার্গের সংগীত রসিক প্রিন্স মার্কগ্রাফ্-এর সংগে। তিনি বহু সুর সংগীত রচয়িতাকে তাঁর জন্যে নূতন সংগীত রচনার অনুজ্ঞা দিতেন এবং বাখ্ পেলেন তাঁর জন্যে কন্চারতো রচনার আমন্ত্রণ। তিনি প্রিন্সের জন্য যে ছয়টি কন্চারতো রচনা ক'রে তাঁকে অতি বিনয় সহকারে উৎসর্গপত্র পাঠিয়েছিলেন সেগুলিই আজ বিখ্যাত ব্রান্ডেনবার্গ কন্চারতো নামে সংগীতবেত্তাদেরমহলে অতি পরিচিত। প্রিন্স মার্কগ্রাফ্ বাখ্-এর এই অমর রচনার জন্য কি পুরস্কার দিয়েছিল তা জানা নেই, কিন্তু প্রিন্সের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহের তালিকা যখন করা হয় তখন তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ না থাকায় বাখ্-এর অমূল্য রচনার স্বরলিপি অন্যান্য রচনার সংগে একজোট ক'রে তার এক একটির যে মূল্য ধার্য করা হয়, তা প্রায় আট ফ্রাঙ্কেরও কম (পাঁচ আনা)। কাল তো শুনলে ঐ ব্রান্ডেনবার্গ কন্চারতোর একটি। সমস্ত অর্কেস্ট্রা যেন সুরের এক রমা উদ্যান রচনা করল। যার শত ফোটা ফুলের ভায়োলিন যেন প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে সেই ফুলগুলি থেকে মধু আহরণ ক'রে আমাদের কর্ণভাণ্ডার সেই অমৃতে ভরে দিল। অর্কেস্ট্রার হৃদয় কোন যন্ত্র দিয়ে তৈরী জান?' আমি 'না' বলায়, মার্থ্ বলল 'ভায়োলিন্'। এই যন্ত্র যেমন করে আমাদের অন্তরে ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে পারে এবং এমন অন্তরঙ্গ কথা জানাতে পারে তেমন আর কোন যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় না। 'বল্লাম 'মার্থ্' আতলিয়েতে আরোতো অনেকে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করে, কনসার্ট শুনতে যায় কিন্তু তারা তো তোমার মতো এমন সুর পাগল নয়। তুমি কোথা থেকে পেলে এই সুরের নেশা?' সে চোখ দুটো বুজিয়ে চুপ ক'রে রইল এবং খানিকক্ষণ পরে বলতে সুরু ক'রল ধীরে—যেন হঠাৎ সময়ের পুকুরে ডুব দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল কতদিনের তলিয়ে-যাওয়া হারানো জিনিস। "আমি যখন খুব ছোট, আমরা থাকতাম একটা ছোট রেলষ্টেশনের কটেজে। আমার পিতা ছিলেন সেই ষ্টেশনের সিগন্যালার। সারাদিন ও সন্ধ্যার কাজের পর, আর সকলে যখন ডিনার শেষে কাফেতে গিয়ে তাস দাবা খেলত, আমার পিতা তখন খাবার পরে বের করতেন তাঁর বহু পুরোন সঙ্গী একটি ভায়োলিন্। তাঁর বাজনা ছিল একঘেঁয়ে কতকগুলো গ্রাম্যসুর কিন্তু আমার মনে হ'ত সেগুলি যেন তাঁর সারাদিনের ক্লান্তিভরা কাজে যে পঙ্গুীভূত বেদনা তারই কথা বলত বিনিয়ে বিনিয়ে। একদিন আমার পিতা অনেক রাত পর্যন্ত ফেরেননি। গভীর রাত্রে কয়েকজন ষ্টেশনের কর্মচারী বসবার ঘরে উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষামানা মাকে এসে কি বলল, তখনি একটা বুকভাঙা আর্তনাদ শুনলাম। মনে হল সেটা যেন আমার মা'র গলার আওয়াজ নয়, ঐ কোণে রাখা ভায়োলিনটা কেসের মধ্যে থেকে চিরে বের করল ঐ শব্দ। কাজের শেষে ক্লান্ত আমার পিতা লাইন পেরিয়ে বাড়ী আসতে লক্ষ্য করেননি আগত ট্রেণ।

বোধহয় জানতেও পারেননি, তার শরীরটা কখন দু'ভাগে কেটে গেল। তারপর যেমন ভোরের জমাট কুয়াশাখণ্ডের মধ্যে পড়লে হাতড়াতে তার বাইরে এসে নজরে পড়ে চেনা পথ ও পরিচিত নিশানা, তেমনি বিগতের সংকার ও তার গণ্ডোগোল কেটে গেলে, আমার চোখে পড়ল ঐ ভায়োলিন্ কেসটার উপর। কেস্টা খুলে বের করলাম ভায়োলিন্খানা, ছড়ি দিয়ে দিলাম কয়েকটি টান তারগুলির উপর কিন্তু বেরুল একটা খস্খসে বিকৃত আওয়াজ—যেন আমার পিতার ভৎর্সনা। তারপর বহু আয়াসে গ্রামের শিক্ষকের কাছে হাতেখড়ি ক'রে ক্রমে

শিখলাম ভায়োলিন্ থেকে সঠিক সুর বাজাতে। প্যারীতে যখন মা এল কাজের খোঁজে এবং হল ক্যাসিয়ার্জ্, আমি অনেক অনুরোধে মাকে রাজী করিয়ে ভর্তি হলাম কন্জরভেতোয়রে। আমার পিতা চ'লে গেছেন কিন্তু যখনি বাজাই ভায়োলিনটা, মনে হয় যেন আমার পিতার হৃদয় আমার হৃদয়ে এসে মিশে গেছে। আমার মাও স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। সেও বোধহয় ঐ ভায়োলিনের সুরের পথ ধ'রে চলে যায় আমার পিতার সান্নিধ্যে। বললাম 'মার্থ, যদি ধৃষ্টতা না মনে কর, তোমায় অনুরোধ করতে পারি কি যে, একদিন তোমার ভায়োলিন্ বাজনা শুনতে দেবে?' সে হঠাৎ উঠে বলল 'চল আতলিয়েতে ফিরবার সময় অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।' জিজ্ঞাসা করলাম সে আমার প্রশ্নে রাগ ক'রেছে কি না; উত্তর এল 'না রাগ করিনি। আমি ভায়োলিন বাজানো অনেক বছর হ'ল ছেড়ে দিয়েছি।' কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'গ্যাব্রিয়েল আমার ভায়োলিনটাকে দেখতে পারত না। শেষে দাঁড়াল হয় ভায়োলিন, নয় তাকে ছাড়তে হয়। তাই দিলাম ভায়োলিনকে ছেড়ে। তার কথা এক বিরাট হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াল কিন্তু আর প্রশ্ন করলে সে রুষ্ট হবে ভেবে আর কিছু জানবার চেষ্টা করলাম না।

এরপর একদিন আমরা পরস্পরকে সেন্ নদীর ধারে বেড়াবার আমন্ত্রণ করলাম। নদীর দু'ধারে উঁচু পাথরের বাঁধের উপর চ'লে গেছে ছোট ছোট টিনের বাক্সের সারি। তার মধ্যে আছে পুরোন, নতুন, খ্যাত কিংবা দুর্লভ বই, ছবি, প্রিণ্ট, সুরকারদের স্বরলিপি, পুরাতন ঐতিহাসিক মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পোর্সেলিনের প্লেট ও ফুলদানী, ব্রোঞ্জও ক্যামিও আরো কত কি। কত ভাগ্যবান রত্নসন্ধানী এই টিনের বাক্স থেকে খুঁজে পেয়েছে অমূল্যরতন। এই সেদিন একজন পঞ্চাশটাকার মত ফ্রাংকে ছবি কিনে আবিষ্কার করল যে, সে একটি বহুমূল্য শিল্পী মুরিলোর চিত্রের অধিকারী এবং প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত ফ্রাংকে মুনাফা পেল সেটা বিক্রী করে। মার্থের ও আমার একটি প্রিণ্ট কিনবার মতও অর্থ সামর্থ নেই—যে ভাগ্যের বাজারে দু'চার পয়সা ফেলে এণ্টিক কেনাবেচার জুয়া খেলি। আমরা অপরের কেনাবেচা দেখি আর ভাবি, এই অগণিত সওদাকারীদের লব্ধ জাঙ্কের স্তূপে কোথায় লুকিয়ে আছে অমূল্য রত্ন, যা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ ক'রে দর্শকদের চোখে তাক্ লাগিয়ে দেবে! চার পাঁচটি টিনের বাক্সের ব্যবধানে ছোট টুল বা চেয়ারে ব'সে বিক্রেতারা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের প্রতি মাঝে মাঝে পড়ে তাদের অলস দৃষ্টি। তাদের আপাতমস্তক দেখে যেন আঁচ ক'রে নেয় কার পকেটে আছে পয়সা এবং কিনবার আগ্রহ। কেউ কোন পণ্যের দাম জানতে চাইলে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে তা বলে। তাদের ঐ নিস্পৃহতার ভাব চলে যায়, যেই কেউ কিনব ব'লে পকেটে দেয় হাত। অদৃশ্য কোন্ স্প্রিং তাদের সর্বাঙ্গ চাঙ্গা ক'রে দেয় এবং হাত মাথা ও জিহ্বার সঞ্চালন এক সাথে হয় ক্ষিপ্র। এই জীবনের অভিনয় আমরা দেখছি শরতের ঠাণ্ডা দিনে। মেঘে ঢাকা দিনের শেষ কি আরম্ভ বোঝা যায় কেবল ঘড়ির কাঁটা দেখে। নদীর দু কিনারায় সারি সারি প্লেন গাছের লালচে সোনালী পাতায় সবুজের আভাস কমে গেছে আর সেগুলি ঝরে পড়ছে বাতাসের একটু কাঁপন লাগলেই। চওড়া যে রাস্তা নদীর কিনারা বেয়ে চলেছে তার একদিকে এই গাছের থামে ভর করা সোনালী পাতার আচ্ছাদন। অন্যদিকে পাঁচ ছ'তলা বাড়ীর সারি এবং মাঝে মাঝে তার জমাটকে তফাৎ করে বড় ফাটলের মত গাঢ় রং-এর রাস্তাগুলি। সেগুলি দৃষ্টিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয় না; আরও ধূসর কালো বাড়ীর ঠেলাঠেলির মধ্যে লুকিয়ে যায় তাদের স্রোত। একটি বেঞ্চির উপরে জমা শুকনো পাতার রাশি সরিয়ে মার্থ আর আমি ব'সে গেলাম শহরের হট্টগোল দেখতে আর

শুনতে। সে বল্লে 'তোমাকে একটা কথা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি কিন্তু প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি না জানি না।' বললাম 'মাদমোয়েজেল্, ওটা শিগ্গির ব'লে মাথা ঠাণ্ডা করে ফেল। উচিত অনুচিতের বোঝাপড়া পরে করা যাবে।' সে জিজ্ঞাসা করল 'দেখ, তোমায় আমি পরিচয়ের প্রথমে বলি যে, আমাদের সম্পর্ক পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে রেখে দিতে হবে এবং সে গণ্ডীকে অতিক্রম করার চেষ্টা যদি কোন দিন কর, তাহলে আমাদের বন্ধুত্বের হবে ঐখানেই সমাপ্তি। ঐখানেই আমি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেব বলায়, তুমি ব'লেছিলে যে তোমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের পরিচিতের গণ্ডী পেরিয়ে নিকট সম্পর্কের কোন সম্ভাবনা হয় না—এ কি সত্যি?' বললাম 'মার্থ তোমার একটু আশ্চর্য লেগেছে, কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকে একটা বেড়া, যাকে কেউ যদি টপ্কে যাবার চেষ্টা করে অমনি সমাজে পড়ে যায় হৈ চৈ। তোমাদের যে এই মেয়ে পুরুষের স্বচ্ছন্দ খোলাখুলি মেলামেশা এ আমাদের দেশে আসতে অনেক দেরী। তবে এ যে আসবে তার আভাস দেখা যায় একটু আধটু। তোমার সঙ্গে যেমন দিনের পর দিন কথা বলি বেড়াই, তাতে আমাদের সম্পর্ক যে কেবল পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এ আমাদের সমাজে ঘটলে লোকেরা কেউ বিশ্বাস করবে না। সেখানে মেয়েপুরুষের—সান্নিধ্যের পরিণতির একট্য বদ্ধ ধারণা আছে—যার ফলে বয়সের তারতম্য থাক বা না থাক, একজন পুরুষের কোন মেয়ের সঙ্গে তিনবার ঘুরতে দেখলেই পড়ে যাবে কানাকানি এবং লোকে মনে করে নেবে তাদের ঐ একই নরনারীর আদিম নৈকট্য ঘটেছে। নরনারীর সাহচর্যে আমাদের সমাজে নিছক বন্ধুত্ব কেউ কল্পনা ক'রতে পারে না। কারণ সেখানে জেণ্ডারকে ভুলবার মত ক্ষমতা সমাজ দিয়ে থাকে না। এটা যেমন অস্বাস্থ্যকর ধারণা বলে মনে করি—তেমনি তোমাদের সমাজ যে অবাধ দৈহিক মিলনকে একটা ডিনার খাওয়ার মত সহজ করে নেয়, তাও আমার ভাল লাগে না। ধর, সেদিনের পিট্কিন, ডাগারম্যান ও নানেৎকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটল। নানেৎ ডাগারম্যানের বান্ধবী এবং আজ কতকাল ধ'রে পিট্কিনও ডাগারম্যানের বিশেষ বন্ধু। ডাগারম্যান মাত্র চারদিনের জন্য প্যারীর বাইরে গিয়েছিল কিন্তু একদিন আগেই ফিরে পিট্কিনের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে আবিষ্কার করল, নানেৎ শয্যায় পিট্কিনের আলিঙ্গনবদ্ধা। সে প্রায় পিট্কিনকে হত্যা ক'রত, নানেৎ দু'জনের মধ্যে না দাঁড়ালে। কিন্তু নানেতের এই ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হ'চ্ছে এই যে, নানেৎ ডাগারম্যানকে সত্যিকার ভালবাসে আর পিট্কিন্ তার বন্ধু ব'লে, তাকেও ভাল-লাগে। একলা নিঃসঙ্গী লাগছিল তার, তাই সে পিট্কিনের সঙ্গে করেছে একটু মিতালী। কিন্তু তাই ব'লে কি তার ডাগারম্যানের প্রতি ভালবাসা ক্ষয়ে গেছে? ছেলেমানুষের মত সে এই নিয়ে কেন একটা সীন্ করল? এই অবাধ স্বচ্ছন্দ প্রণয় দেওয়া-নেওয়াকে, তোমাদের অনেকে বলেন—এ্যাডল্ট্ মনের পরিচয়জ্ঞাপক। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই সোজা বিলি করা প্রণয়ে নেই ভিত্তি, নেই গভীরতা। মার্থ চোখ বড় বড় ক'রে বলল, 'তাহলে তোমাদের মেয়েপুরুষে কোনদিন বন্ধুত্ব হয় না? হয় না প্রেম? হয় কেবল বিবাহ?' বললাম, 'বিবাহ বাদে মেয়ে পুরুষে আমাদের সমাজে বন্ধুত্ব হওয়া দুর্লভ। কারণ তা চাইলেও সমাজ তা সহজে ঘটতে দেবে না। আর বিবাহের বাইরে প্রেম যে একেবারে হয় না তা নয়, তবে তা ঘটে থাকে অন্তরালে অগোচরে, চুরি ক'রে ফল খাওয়ার মতো এবং এ ভাবে প্রণয়াসক্তরা মনে করে যে, তারা ভালবেসে করেছে পাপ।' মার্থ বললে 'কিন্তু তোমাদের দেশের ছেলেরা তো এখানে বেশ প্রেমে পড়ছে এবং আমাদের দেশের ছেলেদের মত বেশ অবাধে সবকিছু ক'রে যায়। আর আমার মনে হয় না, তাদের ধরণ-ধারণ দেখে যে তারা পাপ ক'রে অনুতপ্ত।'

বললাম 'ম্যাদ্‌ময়জেল্‌, তাদের বন্ধ মনটা হঠাৎ তোমাদের সমাজের এত খোলা আবহাওয়ায় এসে একটু উন্মত্ত হ'য়ে যায় কিন্তু এরা দেশে ফিরলেই এখানের অতিবিস্তৃত মনের জালকে গুটিয়ে একটা শক্ত গ্রন্থি দিয়ে তুলে ফেলে স্মৃতির তাকে। কিন্তু বাস্তবে হ'য়ে যায় চলমান সমাজের একটি অংশ, এদেরই অনেকে আবার দেশে ফিরে সমাজ-ধর্মের ঢাক বাজিয়ে শাসায়, যদি কেউ সাহস ক'রে পড়ে প্রেমে এবং ধরা পড়ে যায় এদের নজরে।' সে বল্ল, 'মানলাম তোমার কথা—কিন্তু তোমার দেশের ছেলেরা তো অনেকেই এদেশের মেয়েদের বিবাহ ক'রে ভারতে নিয়ে গেছে। তারা কি সমাজের ঐ ব্যবস্থাই মেনে নেয়? এবং তোমাদের সমাজও তাদের গ্রহণ করে।' বললাম 'সমাজ কেন তাদের গ্রহণ ক'রবে না মাদ্‌ময়জেল্‌, বিবাহ করলেই, পূর্ব প্রণয়ের সকল পাপ থেকে হ'য়ে যায় আমাদের সমাজে মুক্তি। অবশ্য এই বিবাহের ফল যে সর্বদাই শুভ হয়, তা নয়। তোমাদের সমাজ ও জীবনধারা আমাদের জাতীয় জীবন থেকে ভিন্ন—তাই তোমাদের, আমাদের দেশে ঘর সংসার ক'রতে গেলে হয় নিজের দেশীয় সত্তাকে একেবারে ভুলে, বিলিয়ে দিতে হবে আপনাকে, পতির সমাজের রীতি ও ধর্মে; না হলে ক'রে নিতে হবে ছোট, একটু তোমার দেশীয় সমাজের কাঠামো—যার মধ্যে পতিদেবতা তার সমাজ ও স্বজাতিদের পরিত্যাগ ক'রে, পত্নীর বানানো খাঁচায় বাস করবেন। বহুক্ষেত্রে এই দুয়ের ব্যতিক্রম হ'লে হয় দ্বন্দ্ব ও তার শেষ পরিণতি সেপারেশন ও ডিভোর্স। আমাদের দেশের ছেলেরা, এ সম্বন্ধে একেবারেই অবচেতন নয়—যখন তারা এদেশে প্রেমে পড়ে বা করে বিবাহ। বেশীর ভাগই তারা এটাকে গ্রহণ করে তোমাদের পোষাক পরার মত। দেশে ফিরলেই, কাপড় বদলানোর মতো,, বদলে ফেলে রুচি ও আচরণ। অনেকে বিবাহ পর্যন্ত ক'রে পত্নীত্যাগী হ'য়ে দেশে ফিরেছে। সেদিন শুনলাম আমার এক বন্ধুর মুখে একটি ঘটনা। তিনি লুক্‌সাম্‌বুর বাগানে একটি বেঞ্চে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসে একটি ফরাসী মহিলা উলের পুলভার বুনছিলেন আর সামনের বালি-ভরা চত্বরে খেলা করছিল একটি বছর আড়াই কি তিনের মেয়ে। ফরাসীনির দেহের রং সাধারণ শ্বেতকায়ের চেয়েও সাদা আর চুল ফ্যাকাশে সোনালী হ'য়ে প্রায় ব্লন্ডের পর্যায়ে পড়েছে। চোখ দুটি গভীর নীল। কিন্তু শিশুটির রং প্রায় বাদামী আখরোটের মত, কৃষ্ণকাল চুল আর কাককালো চোখ। বন্ধু ভাবলেন, অপর কার মেয়ে, মহিলাটির সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। তিনি কয়েকবার পরিচয় উৎসুক দু'একটা দৃষ্টি বন্ধুর দিকে ফেলে আরম্ভ করলেন—'বেশ দিনটা না? আপনি কি ভারতীয়?'—ইত্যাদি আলাপ করার ছকে ফেলা কথা। তারপর বললেন 'আমার স্বামীও ভারতীয় আর এটি আমাদেরই কন্যা। এই য়্যুগেৎ—মঁসিয়োকে ব'জুর বল।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার স্বামী কি করেন?' তিনি জবাব দিলেন 'ডাক্তার। কিন্তু এখন তিনি ভারতে।' তারপর মহিলাটির চোখে এল জল। তিনি বলে চললেন 'য়্যুগেৎ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাঁকে দেশে ফিরতে হল। বলেছিলেন দু'মাসের মধ্যেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর হ'ল ঐ একই জবাব আসছে। এখনও তিনি পাথেয় সংস্থান ক'রে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া ওদেশী সমাজে আমাকে গ্রহণ করার ছাড়পত্রও তো পেতে সময় লাগবে। কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি আমার সব আশাকে নির্মূল ক'রে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন—'তোমাকে যখন বিবাহ করি সে সময়ে আমাদের দেশের সমাজ-ধর্মের নিয়মে ডাক্তারদের বিবাহে নিষেধ ছিল। ভেবেছিলাম আধুনিক পরিবর্তনের দ্রুত-তালে হবে এই নিয়মের শেষ এবং তোমাকে গৃহে বরণ ক'রে ধন্য হব। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সে নিয়ম এখনও এখানে সমাজে বিশেষ বলবান, তোমাকে ও য়্যুগেৎ-কে কাছে পাবার জন্য আমার বুকভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিরুপায়।' তারপর মহিলাটি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আচ্ছা, তোমাদের দেশের ধর্মের এই বীভৎস ও নির্মম নিয়মের কোনদিন কি সংস্কার হবে না?' বন্ধু বললেন, তিনি এ নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানেন না, কারণ এ নিয়ম ভারতের সর্বত্র ও সর্বজনের নয়। তিনি ভারতের যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে কেউ এই বর্বর প্রথার কথা জানে না বা বলে না। তিনি উঠে গেলেন বেঞ্চি থেকে ভদ্র সম্ভাষণ জানিয়ে এবং মনে মনে পাষন্ড ব্যক্তিটি—যে এই নীচ প্রতারণা করেছে, তার মুন্ডপাত করতে করতে।' মার্থ বললে 'তাহলে কি লোকটা মিথ্যা বলে প্রবঞ্চনা করেছে আর এরকম নিয়ম তোমাদের দেশে নেই?' বললাম 'মাদ্‌ময়জেল্‌, তাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য কিছু ব'লে এই মহিলাটির পাণি-গ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে হবে, তাই সে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠকিয়েছে তাঁর মন।'

হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা

সোমেন বসু

হেমচন্দ্র একদা বৃত্রসংহারের কবি বলেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর সেই খ্যাতি আজ লোকশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তবু একথা হেমচন্দ্রের পাঠক এবং সমালোচকেরা জানেন যে হেমচন্দ্রের মন মহাকাব্য রচয়িতার মন নয় গীতিকবির মন। হেমচন্দ্রের খণ্ডকাব্যের আলোচনা এই কথাই প্রমাণ করবে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা হেমচন্দ্র লেখেন নি। কোন একটি প্রাকৃতিক বস্তু অবলম্বন করে লেখা সুরু করেছেন মাত্র তারপর ভাবের স্রোত মিলিয়ে গিয়ে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক চিন্তার ঠোলাঠেলি সুরু হয়ে গেছে। ফলে কোন একটি বিশেষ ভাবনা রূপ লাভ করার আগেই পুঁথি-পড়া চিন্তার প্রবল প্রবাহ লিরিক কবিতার রস জমে ওঠার ব্যাঘাত ঘটায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মত মন ছিল না হেমচন্দ্রের, তাই পুরানো কবিকৃতির অনুসরণ ছাড়া হেমচন্দ্র নিজের অনুভূতির রসে কোন প্রকৃতির চিত্র আঁকতে পারেন নি।

'লজ্জাবতী লতা' একটি সুন্দর কবিতা। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্যের দীপ্তির মধ্যে লতাটি আছে এক কোণে মুখ ঢেকে চতুর্দিকের তরুলতা অহংকারে দৃপ্ত হয়ে দেখছে নিজের শোভা—সেই অহংকৃত রূপবিলাসের লীলা ক্ষেত্রে মাথা নীচু করে আছে একটি লজ্জাবতী লতা। এই পর্যন্ত বেশ ভালই, মনের উপর কোন ভার না চাপিয়েই একটি ভাললাগার তান ছুঁইয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু তারপরেই যথারীতি কবির মনে একটি তত্ত্ব এসে পড়ে। মানব সংসারেও এমন তো বহু লোক আছেন যাঁরা নিজেদের প্রকাশ করেননি বলেই তাঁদের মূল্য কেউ জানলো না। সংসারে সবাই যখন নিজের নিজের রূপগুণ বর্ণনায় ব্যস্ত তখন—

স্বভাব মৃদুল ধীর প্রকৃতিটি সুগম্ভীর
বিরলে মধুভাষী মানসরঞ্জন
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ।"

পদ্মের মৃণাল দীর্ঘ কবিতা। প্রথম স্তবকে মৃণালের একটি গল্প বর্ণনা আছে। কখনো মৃণালটি ডুবে যায় জলের তলায়, কখনও ভেসে ওঠে। তারপরেই সেই পদ্মের মৃণালের দিকে চেয়ে চেয়ে কবির মনে 'দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে।' কিন্তু সেই শোক মুহূর্তে শেষ হলো তখন জাগলো চিন্তার বেগ। মনে পড়লো অদৃষ্টের কথা। ভাগ্যের উত্থান পতনের কথা, পৃথিবীর প্রাচীন কালের গৌরবের কথা। তারপর পদ্মের মৃণালের মত একটি একটি করে সভ্যতা কালের সমুদ্রে ওঠে নামে মিসর পারস্য গ্রীস রোম ভারত ফ্রান্স ইত্যাদি। দ্রুত ভাবপরিবর্তন এবং চিন্তার প্রাধান্য এ কবিতাকে ভাল গীতিকাব্য হতে দেয়নি। এ কবিতার রসমূল্য আলোচনা করতে গিয়ে 'কাব্যালোক' গ্রন্থে ডাঃ দাসগুপ্ত বলেছেন—

"প্রথম পাঁচটি চরণ অন্ততঃ আমাদের চিত্তে একটি সম্পূর্ণ ছবির রস সঞ্চার করে। মৃণালের দোলার সঙ্গে অন্তর্লোকেও দেয় দোলা এবং লীলাময় আনন্দের সঞ্চার করে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কৌতুকে অবশ চিত্তে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিতেই কবির মনে সুখের নয়, শোকের বেগ উচ্ছ্বসিত হইল। সরোবরের সুনীল হিল্লোলে হেলে দুলে খেলে মৃণাল, আর তার বুকে শত-দলে গাঁথা পদ্মটি। ইহা কিরূপে শোকনাশক স্থায়ীভাবের উদ্দীপনা করিল, আমরা বুঝিতে

অক্ষম। কবি যদি ইহার পর বাসনালোকের স্পন্দন দেখাইয়া শোকভাবকেই করুণ-রসে পরিণত করেন, তবু এক হিসাবে সার্থকতা হয়। কিন্তু কবি সোজা হৃদয়—লোক হইতে বুদ্ধির লোকে প্রবেশ করিলেন এবং ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আরম্ভ করিলেন দার্শনিক চিন্তা। তাঁহার নিকট তরঙ্গান্দোলিত লীলাময় মৃণালটি হইল ক্ষণস্থায়ীত্বের প্রতীক। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'তাই মৃণালের মত হয় কি সকলি?' ভাবিতে লাগিল,—'কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল? দোর্দণ্ড প্রতাপ মার কোথায় সে রোম? আরবের পারস্যের কি দশা এখন? আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি? কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস?'—ইত্যাদি। সকলই কালের হিল্লোলে পদ্মের মৃণালের ন্যায় প্রহার সহিতেছে।

ইহাতে কবির ধ্বনি নাই কোথাও, 'অবোধপূর্ব' স্মরণ নাই কোথাও, আছে কেবল বোধ-পূর্বক চেষ্টাকৃত চিন্তনব্যাপার। বাঙালী একসময়ে এই কবিতার তারিফ করিলেও ইহা উৎকৃষ্ট কবিতা নয়, কেবল ছন্দ ও শব্দ গুণে ও চিন্তার মহত্ত্বে ইহা আদৃত হইয়াছিল।" 'যমুনাতটে' হেম-চন্দ্রের অতি বিখ্যাত কবিতা। এখানেও তাঁর মন দার্শনিকতার ভার থেকে মুক্ত নয়। রাত্রিতে যমুনা-তীরে পূর্ণচন্দ্রালোকিত রূপের বন্যায় কবির প্রাণ জুড়িয়ে আসে। সংসারের জটিল আবর্তে প্রাণ যখন ক্লান্ত তখন প্রকৃতির গোপন নির্জনতা প্রাণ স্নিগ্ধ করে। দিনের কর্মকোলাহলে বিরক্তি আছে, পরিশ্রম আছে তবু দুঃখের কথা কিছুক্ষণের মতো ভুলে থাকা যায় আর রাতে প্রাণ জ্বলে ওঠে প্রাণের দোসর প্রিয়ার জন্যে। তারপর নানা ভাব এল ভীড় করে, সব ভাবনা সেই রাত্রির বুকে জুড়িয়ে গেল। গীতিকবিতার মাধুর্য অল্পবিস্তর থাকলেও ভাবের ঐক্য নেই। অবশ্য এই কবিতায় ব্যক্তিগত দুঃখের ছায়া এসে পড়া আশ্চর্য নয় কারণ তাঁর পিতার মৃত্যুর পরই হেমচন্দ্র এই কবিতা লিখেছিলেন। শেষ স্তবকটি নদীতটের যা কিছু পরিবেশগত স্নিগ্ধতা এক নিমেষেই ঘুচিয়ে দিল —

"বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মবন্ধুজন
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা
জরা মৃত্যু পরকাল যমের তাড়না।

'কুহুস্বরে' কবিতাও হয়তো কোন কোকিলের কলতানের সৃষ্টি। কিন্তু কবি শুধু কোকিল নিয়ে বা তার গানের রস উপভোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কোকিলের কলকণ্ঠের মত গীতোচ্ছ্বাস বাঙ্গালীর অন্তর থেকে আর কেন জাগেনা। সেই দুঃখ প্রত্যেক স্তবকে ফুটে উঠতে লাগলো — বাংলার কবিকুলকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন

কে আছ হে কবিকুলে গভীর-হৃদয়!
গাও একবার শুনি জীবন সার্থক গণি
অমনি মধুর স্বর গভীর উচ্ছ্বাস
ঘুচায়ে এ গভীরের প্রাণের হুতাশ।"

তবু এরই মধ্যে 'পদ্মফুল' কবির এই অহেতুক দার্শনিকতার জাল থেকে মুক্ত। পদ্মকে দেখে কবির মন খুসী হয়, ভাল লাগে। পদ্মফুলের সঙ্গে কবির অন্তরের আত্মীয়তা প্রকাশ পায়। এই ভাল লাগা কতখানি আন্তরিক আর কতটা কবিতা লেখার জন্য সাজিয়ে বলা সে কথা সঠিক বোঝা শক্ত।

হেমচন্দ্রের এই কবিতাগুলির মধ্যে স্বতস্ফূর্ততার অভাব। প্রাকৃতির সৌন্দর্য অনুভব

করার রসদৃষ্টি তাঁর ছিল বলে মনে হয়না। পুরাতন কবি কৃতির অনুসরণে প্রাকৃতিক বস্তু কেন্দ্র করে তিনি কবিতা সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে একটি গভীর তত্ত্বসন্ধান করে কবিতার মূল্য বাড়াতে চেয়েছেন। আন্তরিক প্রেরণার অভাবেই এ কবিতাগুলি এত গম্ভীর এত জটিল-গীতিকবিতার সহজ স্বচ্ছ সারল্য এদের নেই তত্ত্বগত জটিলতা যে মহাকবিদেরও মাঝে মাঝে বিপদ ঘটায় তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি'। সমুদ্রের রূপ, আদিম পৃথিবীর সঙ্গে তার জননীত্বের সম্পর্ক, বর্তমানের ক্ষুব্ধ পৃথিবীকে শান্তি বাণী শোনানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি ভাবগত জটিলতায় সমুদ্রের প্রতি মহাকবির নির্দোষ রচনা নয়। সেই ত্রুটিতেই হেমচন্দ্রের কবিতা কণ্টকিত। পড়ে কখনোই মনে হয়না কবি প্রাণের আনন্দে সহজ আবেগে এগুলি লিখেছেন।

ধর্মবিষয়ক কবিতার সংখ্যা অল্পই—গঙ্গার উৎপত্তি, অন্নপ্রার শিবপূজা, দুর্গোৎসব, গঙ্গার মূর্তি, মণিকর্ণিকা বিশ্বেশ্বরের আরতি।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে এই কবিতাগুলি প্রেমের কবিতাগুলির মত কল্পনার জড়তা নেই। এ কবিতাগুলি অনেক সহজ অনেক তত্ত্বভারবর্জিত। ভাষা ও ভাবের অনুরূপ। হেমচন্দ্রের ধর্মকবিতাগুলিতে সেই নৈরাশ্যের সুরও নেই। বরং অন্তরের সহজ সরল বিশ্বাসের উৎস থেকে ঝরণা ধারার মত সহজ স্রোতে এরা এসেছে। 'গঙ্গার উৎপত্তি' সম্বন্ধে মণীষী রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন "আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সনাতন ধর্মভাবোদ্দীপক।" হেমচন্দ্র যে প্রগাঢ়ভাবে ধার্মিক ছিলেন এ কথা মনে করবার কারণ নেই কিন্তু কাশীবাসের ফলে কোন কোন বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয়েছিল সেইগুলি নিয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন। একটি সাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধানম্র চিত্তের প্রকাশ আমরা দেখেছি এই কবিতাগুলিতে। একটি পবিত্র মনোভাবের ছায়া পড়েছে সর্বত্র। নিজের বেদনাতপ্ত হৃদয়ের সান্ত্বনা খুঁজেছেন এই ঘৃণ্য পরিবেশে

"হে দুর্গে দুর্গতি-হরা কাশীশ্বর গৃহিণি!
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্তপরে
এ সুন্দরী বারাণসী, ওগো শিবমোহিনি?
আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা,
প্রবেশিল অই পুরে অর্ধদণ্ড অন্তরে?

হিন্দুধর্মের প্রতি হেমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল কিন্তু ধর্মগত মত্ততা তাঁর ছিলনা। হিন্দুধর্মের পুণ্য ক্ষেত্রে মুগ্ধ হৃদয়ে তিনি আপন আনন্দ প্রকাশ করেছেন কিন্তু হিন্দু সমাজের সব কিছু নির্বিচারে ভাল বলে মেনে নেন নি। বিধবাদের ব্রহ্মচর্য তাঁর কাছে অত্যাচার বলে মনে হত, ভারতবর্ষে নারীদের উপর যে বিবিধ বিধি নিষেধের বেড়া পাতা তা তিনি পবিত্র হিন্দু ধর্মের দোহাই দিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর ধর্মবোধ মনুষ্যত্বের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। কাশীর দেবতা আর সেই দেবপূজার সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। তাই হিন্দুর অতীত গৌরব গানে মুখর হেমচন্দ্র দেশাচারের সংস্কারগ্রস্ত হিন্দুকে ক্ষমা করতে পরেন নি।

সমসাময়িক ঘটনাসম্পর্কিত কবিতাগুলির মধ্যে 'ভারত কামিনী', 'কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ' উল্লেখযোগ্য। কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ সম্পর্কে বলা হচ্ছে "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ

করেন এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত হয়।" কুলীন কামিনীদের কুল রক্ষার অজুহাতে যে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হতো তার সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে হেমচন্দ্রের 'ভারত-কামিনী' কবিতায়। প্রথম সূত্রপাতেই তীক্ষ্ণ ভাষার আক্রমণ —

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া -সদাচার?
হয়ে আর্যবংশ — অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?

হিন্দুধর্মের সার বস্তু আর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশাচার-এ উভয়ের পার্থক্য তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল। হেমচন্দ্রের অন্যতম জীবনীলেখক অক্ষয় সরকার এই জাতীয় কবিতাগুলির উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন। 'বিধবা রমণী' কবিতায় হেমচন্দ্র বিধবাদের ত্যাগের জয়গান করেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে হিন্দুধর্ম ছারখার হবে বিধবাদের প্রতি অত্যাচারের ফলে। হেমচন্দ্রের বেদনার কারণ তাঁর ঘরেই ছিল—তাঁর বিধবা বোনের দুঃখ না বোঝার মত অমানুষ তিনি ছিলেন না। হিন্দুধর্ম যতই মহৎ হোক যে কুসংস্কার দেশাচারকে এই ধর্ম প্রশ্রয় দিয়েছে তারই জন্য তার বিলুপ্তি ঘটা অসম্ভব নয়। পণ্ডিতের জন্য সহানুভূতি, গভীর মানবতার বোধ তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় পাণ্ডাদের সমগোত্রীয় হতে দেয়নি। তাঁর মত তাঁর আক্রমণ তখন হিন্দুসমাজকে আর কেউ করেনি—

"বালিকা যুবতী ভেদ না করে বিচার
নারী বধ করে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে?
* * * * * *
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার
করিবেন এ দৌরাত্ম সমূলে সংহার;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম ছারখার হবে!
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে!

অক্ষয় সরকার মহাশয় বলছেন যে ঈশ্বরগুপ্তের মত "স্বজাতি-প্রেম, এরূপ দেশ বাৎসল্য হেমচন্দ্রে নাই। থাকলে, 'কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার' লিখিতে, তাঁহার লিখনী কাঁপিত, তাঁহার জিহ্বা জড়াইয়া যাইত। ঐরূপ লেখা যদি স্বজাতি প্রেম হয় তবে স্বজাতি বিদ্বেষ কাহাকে বলে তাহা জানি না। স্বধর্মানুরাগ-জনিত স্বজাতি-প্রেম হেমচন্দ্রে থাকিলে তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য বুঝিতেন —না বুঝিলেও বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, না পারিলে যাবজ্জীবন আলোচনা করিতেন। কিন্তু তা কি?

বিধর্মী মিসনরীর মত হেমচন্দ্র বলিতেছেন
'পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় রে?

* * * স্বজাতি প্রেমে হেমবাবু পৌঁছিতে পারেন নাই, বিজাতি-বৈর পর্যন্ত তাঁহার কবিত্বের

গাঁমা।' বলাবাহুল্য হেমবাবুর মতামত অক্ষয়বাবুর অনুরূপ না হওয়াতেই তিনি এত ক্ষিপ্ত হয়েছেন। সাহিত্যের বিচারে উপরোক্ত সমালোচনা নিতান্তই মূল্যহীন।

বাঙ্গালী মেয়েরা তখন পথে ঘাটে অতি অল্পই বেরুতেন। তবু যেটুকু নারী জাগরণের ঢেউ উঠেছিল হেমচন্দ্র তা পছন্দ করেন নি। তিনি 'বাঙ্গালীর মেয়ে কবিতায় বলছেন—

অহঙ্কারে ফেটে পড়ে চলে যেন ধেয়ে —
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।

পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা উপাধি পেলো তখন আনন্দে অধীর হয়ে সে সম্বন্ধে কবিতা লিখেছেন হেমচন্দ্র। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন তাঁর পুরানো লেখা বাঙ্গালীর মেয়ে কবিতার জন্য। তবে সমসাময়িক ঘটনা কেন্দ্রিক কবিতাগুলির সংবাদপত্রমূল্য আছে সাহিত্যিক মূল্য অল্প। তৎকালীন ঘটনার উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে, কবির চিত্তের সচলতা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু এমন কোন গুণ এই সব কবিতার নেই যা আজও কোন আবেদন আমাদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারে।

'নেভার নেভার', 'বাজিমাৎ', 'হায় কি হলো' ঐ জাতীয় কবিতা। তাঁর স্বাভাবিক সততা ও ভদ্রতাবোধের জন্য তিনিও অনেক অন্যায় ঘটনার প্রতিবাদ না করে পারেন নি। কবিতার প্রতিবাদ লোকমুখে প্রচারিত হয়ে কার্যকরী হয় বেশী। ঈশ্বর গুপ্ত সে পথ বাংলা সাহিত্যে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। পূর্বসূরী ঈশ্বর গুপ্তকে হেমচন্দ্র ভুলতে পারেন নি—

"কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়?
চতুর রসিকরাজ চির রসময়।"

তাঁর নিজের জীবনের দুঃখকর পরিণতির ছায়া পড়েছে দুটি কবিতায়—'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন' 'বিভু কি দশা হবে আমার'—নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের স্পর্শে এ কবিতা দুটি অনেক প্রাণস্পর্শী অনেক জীবন্ত। গীতিকবিতার অনুভূতির গভীরতা, হৃদয়বেদনার সহজ স্বীকৃতি কোন কাব্যকলাকৌশলের অপেক্ষা না রেখেই সুন্দর হয়ে ফুটেছে —

প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
পুলকিত করিবে সকলে,
আমার রজনী শেষে হবেনা কি? হে ভবেশ
জানিব না দিবা কারে বলে?

হেমচন্দ্রের খন্ড কবিতার দ্বারাই তাঁকে স্পষ্ট করে বোঝা যায়। মহাকাব্যের কবি তাঁর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অন্তরালে চাপা পড়ে গেছেন কিন্তু খন্ড কবিতায় কবি মানসের প্রকাশ অনেক সহজতর ও প্রত্যক্ষ। খন্ড কবিতার হেমচন্দ্র দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের কবি। নানা আশাভঙ্গের বেদনায়, দুঃখের কঠিন আঘাতে পীড়িত হেমচন্দ্র তাঁর মর্মপীড়াকে কোথাও গোপন করেন নি। ইংরাজী কবিতার অনুবাদে —

'বলোনা কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন'— ইত্যাদি যে তিনি লিখেছেন সেটা। নিছক অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে একটি দুঃখের ছোঁওয়া এসে লেগেছে। তখনকার বাঙ্গালী জীবন নানা সংশয়ের দোলায় দোলায়িত, আদর্শের সংঘাতে একটা গভীর নৈরাশ্য কোন কোন মহলে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত চঞ্চল। এই অবস্থায় "বাঙ্গালীর কবি হেমচন্দ্র দুঃখের কাহিনী গাহিয়া জীবন উদযাপন করিয়াছেন।"

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসখানেকের ভেতর বাসা দেখতেই হবে একটা। বনবিহারী পারবে না। ভোরে বেরোয়, রাতে ফেরে। তাকেই খুঁজতে হবে। মাস কয়েকের ভেতর আশে পাশে দুচারজন মহিলার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছে ওর। বিশেষ ওই ডাক্তারের বৌ বীণার সঙ্গে। বীণার কাছেই খোঁজ নিতে হবে ঘর খালি আছে কিনা কোথাও। সেধে বলতে হবে একে ওকে তাকে। কাল দুপুরেই ও যাবে বীণার বাড়ী ওদের পাশে ভবানীর মায়ের বাড়ী।

—ঠাকুরপো কই লো?

মৃগনয়নী তাকায়। কালোবৌ ঘরে এসেছে।

—কেন দিদি?

খেতে যাবে না।

—না ভাই দিদি। ও খাবার আনতে গেছে দোকানে।

কালো বৌয়ের মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে,—খাবার? কেন?

—বারে! খেতে হবে না রাত্তিরে? — যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে একটু হাসে মৃগনয়নী।

কালোবৌ দোরের দুপাশের চৌকাঠ ধরে একটু সময় দাঁড়ায়। তারপর আর একটা কথাও বলে না। আস্তে আস্তে চলে যায়। মৃগনয়নীর মনটা একটু ভিজে ভিজে লাগে। কালোবৌয়ের জন্যে ওর মনের কোথায় একটু দুর্বল জায়গা আছে। সেইখানটা ভিজে উঠেছে। কারুর ওপর দাবী নেই। না স্বামীর ওপর, না দেওরের জায়ের ওপর, না সতীনের ওপর। সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু আঘাত সয়ে যাওয়া। অভিমান কাকে বলে জীবনে জানা গেল না, আর ভালবাসা? কারই বা পাওয়া গেল! কালোবৌয়ের অন্তর তবু কেন যে কালো হয়ে ওঠে না— এইটেই সংসারের এক বিস্ময়। কিছু না পেতে না পেতে পাবার যে কিছু একটু অধিকার আছে এ কথাও বোধহয় ভুলে যেতে হয়। সবাই মানুষ বলে না ভাবলে নিজে যে মানুষ এ কথাও বোধ-হয় ভুল হয়ে যায়। কালোবৌ ধীরে ধীরে গিয়ে নিজের তক্তপোষে শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী চুপ করে বসে আছে। তখনও ফেরেনি বনবিহারী। গেছে তা অনেকক্ষণ! এত দেরী হয় খাবার আনতে। রাস্তায় গিয়ে আবার ভিমরী খেয়ে পড়েনি ত'? কেমন একটা দুশ্চিন্তা এসে ওর মনকে গ্রাস করে। স্বামীর জন্যে এই প্রথম দুশ্চিন্তা। ভাবতে বেশ ভাল লাগে। ভাল লাগে উৎকন্ঠিত হতে। সে যে ভাবছে এটা দেখাতেও ভাল লাগে। ছেলে কোলে করে ঘর থেকে বেরোয় মৃগনয়নী। দোরের কাছে গিয়ে বসে থাকে গলির মোড়ের দিকে। অন্ধকার গলিটার মোড়ে গ্যাসের আলো এসে পড়েছে। গলির এদিকটা অন্ধকার। আরও অন্ধকার গলির শেষের দিকটা। ওদিকটা একটা পাঁচীলের ওপারে মাঠ তার দুধারে খোলার বস্তি। সেখানে তীব্র পানীয় আর ঝাঁল মাংসের ভুরভুরে গন্ধ। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গোলমাল। ঝকঝকে ছোরার ঝিলিক দেখা যায়। খোকা-গুন্ডার নামে ও পাড়ার রূপপসারিণীরাও চমকে ওঠে। বসে আছে মৃগনয়নী। ঠায় বসে আছে দোরের সামনে। নতুন বৌ শুয়ে পড়েছে ঘরে। তার পাশে বসে হাওয়া খাচ্ছে বড় ভাই।

—এমন এক একটা কান্ড করো! কি যে যাতা বলে ফেললাম ওদের!

নতুন বৌ বলে— আমি আর কি করলুম।

—তোমার জন্যেই ত'?

—বেশ ত' আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ওদের নিয়েই থাকো।

অতি পুরাতন কথা। তবু এতেই বড় ভাই একটু ঘায়েল হয়।

—সে কথা হচ্ছে না। বৌমার সামনে এমন কাণ্ডটা না হলেই ভাল হত।

—না করে কি কোন উপায় ছিল?

—কেন?

—এত বড় সংসার চালাতে পারতে?

—তা' পারা যেত।

—ঠাকুর পো ক'টাকা দেয় শুনি?

—যাই দিক। আমার রোজগার ত' অনেক বেশী!

—তোমার রোজগারে ওদের খাওয়ালে, আমার আর দিদির ভবিষ্যতে কি হবে।

—মানে— কি বলছ—।

—বলছি ঠিক। ঠাকুরপোর ছেলে আছে। আমাদের কি আছে।

এমন একটা দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে নতুন বৌ বড় ভাই একেবারে ধরাশায়ী।

—বলো?

—তাই বলে—?

—হ্যাঁ, আমাদের প্রাপ্য আমরা ছাড়ব না। সামনের মাস থেকে অন্ততঃ পাঁচ ভরি করে গয়না করতেই হবে। আমার কাছে পষ্ট কথা।

চুপ করে থাকে বড় ভাই। মোটাসোটা মানুষটা যে কেঁচোর মত দুর্বল হয়ে পড়ে। একটা কথারও আর জবাব দিতে পারে না। নতুন বৌ আর বেশী বলে না। যেটুকু বলবার দরকার ছিল সেটুকু ঠিকমতই বলা হয়েছে।

—খাবে চলো।

—খিদে নেই তেমন।

—তবু একটু কিছু মুখে দিয়ে আসবে চলো।

কালো বৌ বারান্দা থেকে সব শুনেছিল। এবার উঠে পড়ে। নতুন বৌ এ ব্যাপারের ভেতর যে তাকেও জড়িয়েছে এইটেই তার সবচেয়ে খারাপ লাগে। তার ভবিষ্যত কি। তা নতুন বৌ কি জানবে, সে নিজেও জানে না। জানে একজন, তার কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা করে গোপনে। কেউ জানে না। কেউ জানবেও না। নতুন বৌয়ের কথাগুলো হাসি পাবার মত।

—দিদি ভাত দোব চলো।

বড়ভাই কালো বৌয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে একবার বলে,—ওদের ডাক।

স্বামীর অসহায় অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝেও কালোবৌ বলে,—ওরা আর এ ঘরে খাবে না।

বড় ভাইয়ের কণ্ঠে হতাশ।—বললে?

—হ্যাঁ। বললে।

বলেই কালো বৌ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

এতক্ষণে বনবিহারীকে দেখা যাচ্ছে গলির মোড়ে। মৃগনয়নী কোলে ছেলে নিয়েই নড়ে-চড়ে বসে। রোগা লম্বা ছায়া পড়েছে গ্যাসের আলোয়। হন্‌হন্ করে আসছে। কাছে এসে

মৃগনয়নীকে দেখে একটু অবাক হয় বনবিহারী।

—কি হোল? এখানে বসে?

উঠতে উঠতে বলে মৃগনয়নী।—কি আক্কেল তোমার। কখন বেরিয়েছো?

বনবিহারী মনে মনে খুব খুসী হয়ে ওঠে। বলে,—গরম পুরি ভাজিয়ে আনলুম। তাই দেরী হোল।

ঘরে যায় ওরা।

মৃগনয়নী একখানি ডিস ভাল করে ধুয়ে খাবার সাজিয়ে দেয় বনবিহারীর সামনে।

হাসে একটু।

—হাসছ?

—এমনি।—সত্যিই এমনি এমনি হাসি পাচ্ছে মৃগনয়নীর।

গরম গরম পুরি খেতে বেশ ভালই লাগে। অনেকগুলো খেয়ে ফেলবার পর চমক ভেঙে বলে,—এই যা! তোমার আছে ত'?

আর মাত্র দুখানি ছিল। মৃগনয়নী হাসে।

—হাসছ যে?

—এমনি। আছে আমার খাবার।

হাতমুখ ধুয়ে বনবিহারী পরম তৃপ্তিতে বিছানার ওপর বসে একটা বিড়ি ধরায়। মৃগনয়নী ওরদিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে খেতে বসে, যাতে ও দেখতে না পায়। বনবিহারীর দেখবার বিশেষ আগ্রহও নেই। কাল অপিসে গিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হবে। এই চিন্তাটাই ওর মাথায় ঘোরে। মৃগনয়নী হাতমুখ সাপটে বিছানায় আসে। খোকাকে কাঁথাটা পালটে শোওয়ায়। আলোটা নেভায়। বনবিহারী শুয়ে পড়ে। মৃগনয়নী বসে থাকে। ঘরের এই অন্ধকারটুকুও অন্যরকম লাগে আজ। এই ঘরের অন্ধকারটুকুও যেন ওর সম্পূর্ণ নিজের। ও বসে থাকে অন্ধকারে। তাকিয়েই থাকে।

—ঘুমোলে?

—না।

আমরা চলে গেলে নতুন বৌ ত' রাজত্ব করবে, কিন্তু দিদির কি হবে?

দিদি অর্থাৎ কালো বৌ।

—কালো বৌঠানের কথা ভাবিনি। যেমন আছে এমনিই থাকবে।

—কি কষ্ট বলত? তোমরা থাকতে এমন হোল।

বনবিহারীর উত্তর তখুনি তখুনি শোনা যায় না। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। তারপর শোনা যায়-কি জান, একএকজনের বরাতই দেখিচি ওমনি ধারা। মৃগনয়নীত কথাটা বিশ্বাস করে। নইলে তার পুটিদির মত অমন নিরীহ মেয়ের কি না কষ্ট! আর কি নীরবেই এরা সয়? আর দিদি? দিদি কিন্তু ভাগ্যকে মেনে নেয় নি কোনদিন। ভাগ্যের বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়েছে। সব কিছুর বাঁধন তুচ্ছ করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু হেরে গেল। তরঙ্গিনীর পথ দুর্গম, নিদারুণ সাহসে বুক বেঁধে যাত্রা করেছিল। শেষে কি হোল সত্যিই কি হারল?

কাল একখানা খাম আনবে?

কেন?

পুটিদিকে একখানা চিঠি লিখব।

আনব।

মৃগনয়নী লিখবে। দিদির কথাই জানতে চাইবে। দিদির হতাশ চোখদুটো এখনও চোখের সামনে ভাসছে। অন্ধকারেও সামনে দেখতে পাচ্ছে, তেমনি পাদুখানা ভেঙে মাথাটা গুঁজে বসে আছে তরঙ্গিনী। ধবধরে মাংসল পিঠখানার ওপর কালো চুলের বোঝা। বুক থেকে কোমরের দিকটা অনাবৃত। ঘেমে গেছে কোমরখানা। ঘামে ঘামে কি বিশ্রী। ঘৃণায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মৃগনয়নীর। এ কি সব ভাবছে সে?

রাধারাণীর মাংসল ধবধরে ঘাড়খানার ওপর ঝকঝকে রাম দা। ঠিক তেমনি অনাবৃত ধবধবে দেহখানা তরঙ্গিনীর এক অদৃশ্য খাড়ার তলায়। কর্তাবাবুর সজল চোখদুটো। মৃত্যুর পূর্বের জোলো চোখদুটোর কথা মনে হয়। তারই নিজে হাতে মাটি তোলা বিশাল গহ্বর। একের একটি প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! ভবিষ্যতের এই যেন নিষ্ঠুর বিধান। এ সব কি ভাবছে মৃগনয়নী? ঝগড়া চিৎকারের পর শরীরটা ভাল লাগছে না। মাথাটাও কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। ঘুম আসছে না! উঠে দোর খোলে। দোর খুলেই চম্‌কে ওঠে। বারান্দায় অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে? মৃগনয়নী ভয় পাবার মেয়ে নয়। আস্তে আস্তে এগোয়। ছায়া-মূর্তিটি নড়ে না। প্রায় কাছাকাছি গিয়ে মৃগনয়নী বলে,—কে? মূর্তিটি চমকে ওঠে,—আমি। কালোবৌয়ের গলা।

দিদি এত রাত্রে এভাবে?

কালোবৌ চোখদুটো মুছে নেয়,—ঘুম আসছে না তাই!

আমারও। কেন বলোত?

কালোবৌ তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মৃগনয়নীও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর একটা কথাও বলতে পারে না। ভারি অদ্ভুত লাগে। মনের ভেতরে কত কথার ফুলঝুরি। বাইরে একটিও নয়। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দুজন। দুজনের ভেতরেই অনেক কথা। অনেক কথা বলার রয়েছে। তবু একটা কথাও বলা গেল না। আস্তে আস্তে মৃগনয়নী কলতলার দিকে যায়। হাত পা ধোয়। ঘাড়ে চোখে মুখে জল দেয়। ফিরে আসে নিজের ঘরের কাছে। দেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে কালোবৌ। থাক। সে কি করতে পারে। কিছু না। দোর খুলে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী। আজ ঘুমোতে হবে। কাল বাসা দেখতেই হবে। যেতে হবে ভবানীর মায়ের কাছে, ডাক্তারের বৌ বাঁণার কাছে। আর ধীরেন বাবুদের বাড়ী। থাক। ওখানে আর নাই বা গেল। ভদ্রলোক এক বিধবা ঝিয়ের সঙ্গে বসবাস করেন, তারই কয়েকটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদের নিয়েই আছেন। সবাই জানে। কে কি বলবে? ভাল চাকরী করে, এত বড় বাড়ীর মালিক। তার ওপর জায়গাটার নাম শহর কলকাতা। ঝিটি কিন্তু বেশ। একদিন আলাপ হয়েছিল মৃগনয়নীর সঙ্গে। জিতেনবাবুকে 'বাবু' বলেই ডাকে। যাবার সময় মিষ্টি হেসে বলেছিল, যাই বাবুর আসবার সময় হোল। জলখাবার গরম গরম নইলে আবার রোচে না আর ডাক্তারের বৌ বাঁণা? ওর ও ত' স্বামী ডাক্তার নয়। লোকে বলে। বাঁণা বলে না। এক বিঘে জায়গায় কত কেলেঙ্কারী। চোখদুটো বুজে আসে মৃগনয়নীর, ঘুম আসছে।

সতেরো

জীবনের এই একটা বড় বাঁক। বলত' মৃগনয়নী তখন-তখন, কি এক খুসীর নেশায় মজে ছিলাম। বারোটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল যেন টেরই পেলাম না। খুসীর দিনগুলো সংসারে পিছলে যায় চোখের নিমেষে। মনে হয় এই ত' সেদিনের কথা। আহা, কোথায় যে

গেল দিনগুলো। বেদনার দিনগুলো যেন মরচে ধরা। ঘসে ঘসে চলে। প্রতিটি মুহূর্ত জানান দিয়ে যায়। মুহূর্তগুলো কাটতে আর চায় না। এ এক বিস্ময়।

বিস্ময় নয়। মৃগনয়নী নিজেই বলত, অবাক কিছু নয়। এমন ত' হয়েই থাকে। বরং আজ মনে হয় দুঃখের যে দিনগুলো ঘসে ঘসে কেটেছে, সেগুলো মনের অনেক ময়লা কাটিয়ে দিয়ে গেছে। ময়লা কি সহজে কাটে। রাহু জন্মের ময়লা না ঘসলে কাটে না।

তখন-তখন কি দিনই গেছে। উৎসাহের আর অন্ত নেই। নোতুন বাসা বাধবার কত চেষ্টা। যেন একটা একটা করে খড় কুটো জোগাড় করে করে নিজের একটি বাসা বাঁধা। ঘোরাঘুরির শেষ নেই। এই সময়টায়ই ছিল জীবনের সবচেয়ে খুসীর খেলা।

গিয়েছিল মৃগনয়নী ভবানীর মায়ের বাড়ী। কথা বলল, কথায় কথা বাড়ল। নতুন-বৌয়ের কথা সব যে ঠিক ঠিক বলেছিল তা নয়, অনেক বাড়িয়ে বলল।

টিক'তে আর দিলে না দিদি। ঢের ঢের দেখেছি, এমন মেয়ে মানুষ আর দেখিনি।

তা বই কি!

সহানুভূতি পাওয়া গেল কিন্তু ঘর পাওয়া গেল না। কত কথাই বলতে পারলো তখন মৃগনয়নী। ওর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে ভবানীকে দেখে হেসে বললে,—এটিকে কিন্তু ভাই আমি নোব। আপত্তি কি, আপনারা ত' বামুন।

ভবানীর মা হাসলো,—বেশত! আপনার ছেলে বড় হোক। ও বড় হোক।

তবুও ঘরের খোঁজ পাওয়া গেল না। ডাক্তারের বৌ বাঁণার কাছেও যাওয়া হোল। বাঁণার কাছেও সেই একই কথা বলতে হোল। বাঁণাও খোঁজ দিতে পারলো না। এমনি তেই কয়েকদিন কাটছিল। রান্না আলাদা হচ্ছিল একই বাড়ীতে।

এরি ভেতর ভাসুর ঠাকুর বনবিহারীকে ডেকে বললে,—তুই কি ঘর খুঁজছিস?

হ্যাঁ।

তা এখনি একেবারে অন্য বাসায় যাবার কি দরকার।

বনবিহারী মাথা চুলকে চলে এল। মৃগনয়নী বেঁকে বসল। না। তা হবে না। এক বাসায় আলাদা রান্না অসম্ভব। শেষকালে ঘুঁটে কয়লা নিয়ে মারামারি হবে। বনবিহারী এখানেও মাথা চুলকোল। মৃগনয়নীকে অগত্যা যেতে হোল ধীরেনবাবুর পোষা ঝিটির কাছে।

আপনার বাবুকে বলুন না। একখানা ঘর হলেই আমার চলবে।

মেয়েমানুষটি সাদা থান পরনে, মাথায় সিঁদুর নেই। নিজের পূর্ব পরিচয় লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। আগের স্বামীর একটি মেয়ে ছিল, সেটিকে নিয়েই বেরিয়ে এসেছিলো। মেয়েটির নাম বিভা। সবাই একে বলে বিভার মা।

সব শুনে বিভার মা বললেন,—আহা বামুনের ঘরের বৌ, এমন কষ্টে পড়েছ। বাবুকে বলে আমি নিশ্চয় ঘর দোব তোমায়।

আশ্বাস পোলো মৃগনয়নী। বিভা মেয়েটাকে কোলে বসাল। আদর করল। ধীরেন বাবুর কাছে থাকাকালীন যে দুটি ছেলে হয়েছে, সেদুটি খুব বাচ্চা। বিভার মায়ের কাছে তিনটিই সমান। ধীরেনবাবুও মানিয়ে নিতে পেরেছেন। বিভার মা মৃগনয়নীর খোকার জন্যে একটা সন্দেশ এনে ভয়ে ভয়ে বলে,—দোব' অর্থাৎ ওর ছোঁয়া খাবে কিনা!

নিশ্চয়।

বিভার মা খবু খুসী। মৃগনয়নী শেষ পর্যন্ত বাসা পেলো। দিনকতকের ভেতরই

বিভার মা তার বাবুকে বলে ঘর ঠিক করে দিলে। দোতলার একখানা ঘর। নীচে রান্নাঘর। কলতলা তিন ভাড়াটের।

মাসের প্রথমেই এই বাসায় চলে এলো ওরা। আসবার সময় কেউ কিছুই বললে না। কালোবৌকেও দেখা গেল না সে সময়। সময়টা ছিল সকাল। বনবিহারী সকালে উঠেই মুটে ডেকে আনলে দুটো। দুটো মুটেই যথেষ্ট। মালপত্র নেয়া সুরু হোল। বড় ভাই দেখল। একটা কথাও বলল না। যথারীতি মিষ্টান্নির সরবত খেয়ে অপিসে বেরিয়ে গেল। নতুনবৌ বোধহয় রান্নাঘরে, না অন্য কোথাও? জিনিষপত্র নেয়া শেষ হলে মুটের টাকা মিটিয়ে দিয়ে বনবিহারী একটা বিঁড়ি ধরিয়ে বসে পড়ে' ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় পরিশ্রমে। ফরসা রোগা পিঠখানা ঘামে ভিজে ওঠে। মৃগনয়নী আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে দেয়। এমন কখনও করে না। কিন্তু আজ বনবিহারীর গায়ের ঘাম ওর মন ভিজিয়ে দেয়।

তুমি বরং একটু জিরোও। আমি ও বাড়ী গিয়ে জিনিষ গুছিয়ে আনি।

বনবিহারী বিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে,—তারচেয়ে বরং একেবারে চল, ওখানে গিয়ে বিশ্রাম করে চান সেরে অপিসে বেরোব।

যাওয়ায় পর্বটা চুকিয়ে ফেলতে চায় বনবিহারী। বিদায়ের পালাটা ওর কাছে কেমন যেন আতংক ভরা মনে হয়। মৃগনয়নী বলে,—বেশ তাই চলো। তুমি এই বালতীটা নিতে পারবে। হারিকেন দুটো আর পাখা আমি নেব। বনবিহারী বালতীটার ভেতর দড়িদড়াগুলো ভরে। মৃগনয়নী একবার নতুনবৌয়ের ঘরের দিকে যায়। বোধকরি মৃগনয়নীকে আসতে দেখে নতুনবৌ ঘরের দোরটা ভেজিয়ে ভেতরে চলে যায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মৃগনয়নী, ভেতরটা যেন জ্বলে যায়। কালোবৌয়ের খোঁজে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। তবু একবার রান্নাঘরের দিকে যায়। নেই। রান্নাঘরে কালোবৌ নেই। খোকার হাতটা ধরে চলে আসে নিজের ঘরের সামনে। হারিকেন দুটো আর পাখা হাতে নেয়। খোকাকে বাঁ কাঁকে কোলে নিতে হয়।

বনবিহারীও ওঠে, জিজ্ঞেস করে আস্তে,—দেখা হোল?

তারপর আগে আগে হনহন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

না।—বলে মৃগনয়নী।

ওর পেছন বালতী হাতে বনবিহারী। বাড়ীটাকে পেছনে ফেলে গলির ভেতরে অনেকটা এগোতে হয়। এগোচ্ছে ত' এগোচ্ছেই। মনে হয় যেন অনেক কাল ধরে চলতে হবে। এমনই করেই। আগে-আগে মৃগনয়নী ছেলে কোলে লণ্ঠন হাতে। পেছনে বোঝা নিয়ে বনবিহারী। কমলীর দিদিমা দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এ বাড়ীর আর এক ভাড়াটে কমলীর মা আর দিদিমা। মৃগনয়নীকে দেখে বলেন,—ঘরটা বাছা অমন ধারা খুলে রেখে কি যায়! ভাগ্যিস আমি ছেলুম! মৃগনয়নীর মুখখানা ঘেমে গেছে। চোখে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ চাহনী। একটু হেসে, বালতীটা নামিয়ে বনবিহারীকেই ঘরের শেকল খুলতে হয়। ঘরে মাল-পত্র ছড়ান। বনবিহারী আবার বসে পড়ে। বিঁড়ি ধরায়। বেশ ভাল করে নিশ্বাস নেয় কয়েকটা। মৃগনয়নী ঘরে ঢুকে ছেলেকে নামায়।

(ক্রমশঃ)

ছায়া ছবি

রমাপ্রসাদ দে

হৃদয়ের আরো কাছাকাছি
উড়ে আসে একঝাঁক বুনো মৌমাছি।
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্
ঝোপ-ঝাড়-ফুলবনে চুপি চুপি ছড়ায় আগুন,
আধো-হাসি জ্বলে ওঠা জোনাকির মত।

রাত্রি এখন কত?
আমার জাহাজখানি
পেয়েছে কি তটরেখা?
ঝিকিমিকি জোনাকির আলপনা-লেখা?

সে লেখাও মুছে যায়। বন্দর আরো দূরে হাসে—
এবং সূর্য ওঠে নীলসোনা পূর্বের আকাশে।

বাদাম গাছের নীচে

সুনীল বসু

আমার মনের ব্যথার মেঘেরা অশ্রুতে গলে যায়
গাছের পাতার আঁকাবাঁকা যত জাফরি সে জানালায়।
জরিদার রোদ বিকেলের বালুতট
ছেয়ে দিল যত দেওদার চারুবট,
ছাড়িয়ে ছড়ায় প্রকৃতির স্থলে জলে
মিহি তৃণ মখমলে।
আমি বসে থাকি থমথমে বুক

চোখে উৎসুক
বাদাম গাছের নিচে
অশ্রুতে চোখ ভিজে।
তোমার আসার কথা ছিল আজ
যখন জ্বলবে আকাশে—চাঁদের তাজ
তখন লগ্ন শুভ লক্ষ্যের
প্রীতসন্ধ্যের
তখনি জানবে বলেছিলে তুমি পরিণীত হবে কি না,
তখনি বাঁধবে মহা-আত্মার অদৃশ্য মনোবীনা,
বুঝি সে প্রতিশ্রুতি
অন্তরাগের বিষণ্ণতায় হারায় দ্যুতি।

জ্বলে চিকচিক শেষ রোদ্দুর
কাঁখের কলস করে ছলছল পল্লী বধূর;
যারা চেনে তারা আমাকে উদাস দেখে
চলে যায় এঁকে বেঁকে ঃ
নেমেছে অন্ধকার
ধরেছ কী ট্রেন অনামিকা সন্ধ্যার ?—
আমি বসে থাকি বাদাম গাছেরর নিচে
কপোল আমার অশ্রুতে গেল ভিজে॥

বিষয় বনাম ভাষা

বারো বছরের এক কিশোর আমার চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বৎসর; তবু সে আমাকে তার মনোজীবনের সঙ্গী বলে জানে।

সেই এক জাগ্রৎচিত্ত, অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলী কিশোরকে সামনে রেখে আমার প্রশ্ন ঃ কী শিখতে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়—বিষয়, না ভাষা? আর সেই প্রসঙ্গেই আমার দ্বিতীয়, নির্দিষ্ট প্রশ্ন ঃ মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরেজী কতদূর?

যে ছেলে নিরেট বোকা নয়, কল্পনাশক্তি অনুভবশক্তি যার মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে, স্মৃতিশক্তি যার দুর্বল নয়, সেই ছেলে অসংখ্য জিজ্ঞাসা নিয়ে ইস্কুলে যায়। জিজ্ঞাসা—নিজেকে নিয়ে, নিজের নিকট পরিবেশকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে, পরিচিত অল্প-পরিচিত জীবজগৎকে নিয়ে; তার পক্ষে কিছুটা দূরবর্তী মানব-সমাজ সম্পর্কে, মানব-ইতিহাস সম্পর্কেও তার মনে প্রশ্ন জাগে।

ভাষা কী? এই-সব বিচিত্র জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির যন্ত্র। ভাষা বহুবিচিত্র তথ্য আহরণের যন্ত্র, তাদের বর্গীকরণের যন্ত্র, তাদের তত্ত্বরূপে সাম্রাজ্যীকরণের যন্ত্র, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের যন্ত্র, এবং সামান্যীকৃত সংশ্লেষিত ভাবরাশিকে মৌখিক আর লিখিত প্রকাশের দ্বারা ব্যাপ্তীকরণের যন্ত্র।

সে ভাষা কোন্ ভাষা? তর্কাতীতভাবে মাতৃভাষা, একমাত্র মাতৃভাষা—অন্তত —জীবনের সেই কালে যখন বৃত্তিনিয়ে সবে প্রস্ফুট হয়েছে।

সার কথা তাহলে এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে, মানবসমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ,আর ভাষা তথা মাতৃভাষা, হল সেই জ্ঞানাহরণের যন্ত্র।

এটি অত্যন্ত পুরনো কথা, কিন্তু সংশয়াতীতরূপে সত্য কথা।

দুই

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থদেহ সুস্থমনা মানুষ একাগ্র হয়ে একটানা কতক্ষণ কাজ করতে পারে?

আট ঘন্টা। মাথা খাটিয়ে কাজ হলে— সাত ঘন্টা। অর্থাৎ, সারা দিনরাত্রির এক-তৃতীয়াংশে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মানুষের সমাজ এই সাত আর আট ঘন্টার কাজের দিনকে ভদ্র 'নর্ম' বা রীতি বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মাথা খাটানোর কাজ হলে একটানা সাত ঘন্টা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষে এই যদি 'নর্ম' হয়, তাহলে বারো বছরের এক কিশোর একটানা কতক্ষণ পড়াশোনার কাজ করতে পারে? পাঁচ ঘন্টা। একটু ফাঁক দিয়ে দিয়ে হলে ছ' ঘন্টা—সারা দিনরাত্রির এক-চতুর্থাংশ কাল। এর বেশি সময় পড়াও সম্ভব নয়, পড়ানোও উচিত নয়।

আমি যে কিশোরটির সমস্যা নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি সে গড়ে সাত ঘন্টা পড়ে।

তবু সে কূল পাচ্ছে না। স্পষ্ট করে বলতে পারে না, তবু তার অসহায় নিরুপায়তা বুঝি, সে আমার সাহায্যের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু আমি কী করতে পারি? একটি নয়, দুটি নয়, তিন-তিনটি ভাষার নাগপাশে যে ছেলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাকে আমি কী করে সত্যিকার জ্ঞানের রাজ্যে, বস্তুপরিচয়ের রাজ্যে উদ্ধার করে নিয়ে আসব? সেই পথের সন্ধান কেউ জানেন কি যে পথে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, আবার তিনটি ভাষা আর তিনটি লিপি—বাঙলা, ইংরেজী, নাগরী—মোটের উপর আয়ত্ত হয়?

অসম্ভব। সে পথের সন্ধান কেউ জানেন না।

আমার ছাত্রটির সমস্যাকে খুব জ্বলজ্যান্ত করে তুলে ধরছি ঃ

ইস্কুলে তার কাটে ৫ ঘণ্টা—৩০০ মিনিট। অবকাশের ৩০ মিনিট বাদ দিয়ে ২৭০ মিনিট সে পড়ে শোনে লেখে। এই ২৭০ মিনিটের মধ্যে সে ভাষা শেখে ১৮০ মিনিট (ইংরেজী ৯০, বাঙলা ৪৫, সংস্কৃত ৪৫)—সমগ্র শিক্ষাকালের তিন ভাগের দু ভাগ সময় ধরে সে শেখে কী? তিন টি ভাষা। বারো বছরের প্রফুটচিত্ত একটি কিশোর শিখছে তিন-তিনটি ভাষা (এবং তিন-তিনটি লিপি)! বাকি ৯০ মিনিটে সে কী পড়ে? সত্যিকার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি—গণিত,ইতিহাস, ভূগোল, নানাবিষয়ক বিজ্ঞান। শিক্ষানীতি কী অচিন্তনীয়ভাবে বাস্তবতা-বিবর্জিত হলে এমন উদ্ভট অঘটন ঘটে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সাত ঘন্টার মধ্যে ছেলেটির পাঁচ ঘন্টা কাটে ইস্কুলে। সকালে সে দু ঘন্টা পড়ে। সন্ধ্যায়ও কিছুক্ষণ পড়ে—কিন্তু ইস্কুলের বই নয়। কোনো কোনোদিন পড়েও না—ওআর্ড-মেকিং খেলে, আঁকে, মেকানো নিয়ে বসে।

সকালে দু ঘন্টায় তাকে কী কী পড়তে হয়? ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত। অঙ্ক কষতে হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনোদিন ইতিহাস পড়তে হয়, কোনোদিন ভূগোল, কোনোদিন বিজ্ঞান।

দু ঘন্টায় এত সব পড়া যায়? পাঁচটি বুদ্ধির অঙ্ক কষে, কালি দিয়ে পাকা খাতায় তুলতে কতক্ষণ লাগে? আধ ঘণ্টা কম নয়। একটি ধাতুরূপ মুখস্থ করে বই না-দেখে নাগরী লিপিতে লিখতে হলে কতক্ষণ সময় লাগে? পঁচিশ মিনিটের কম নয়। দশটি বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ করে পাকা খাতায় তুলতে কতক্ষণ সময় লাগে? বিশ মিনিটের কম নয়। ইংরেজী টেক্সট্‌-এর দশ লাইন পড়া অভিধানের সাহায্য নিয়ে বুঝে, তার বাঙলা অর্থ লিখতে, তার ব্যাকরণগত গঠন ইত্যাদি বুঝতে কতক্ষণ সময় লাগে? পৌনে এক ঘন্টার কম কিছুতেই নয়।

এই করতেই দু ঘন্টা উৎরে গেল। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান পড়বে কখন, বুঝবে কখন, লিখবে কখন? এবং, লক্ষ্য করবেন, বাঙলা পড়া হল না।

এবার মোট হিসাবটি নেওয়া যায় ঃ সারা দিনেরাতে যে ছাত্র অ্যাকাডেমিক বিদ্যাচর্চা করে ৩৯০ মিনিট, তার ২৭০ মিনিট যায় ভাষা শিক্ষা করতে; আর এই ২৭০ মিনিট ভাষা-শিক্ষার মধ্যে শুদ্ধু ইংরেজীই গ্রাস করে ১৫৫ মিনিট—আড়াই ঘন্টা।

তিন

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ" এই উদ্ভট পাঠন-নীতিতে কিছুতেই তৈরী হতে পারে না।

সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তবু আমাদের হুঁশ নেই, আত্মসংশোধনের প্রবৃত্তি নেই।

মাধ্যমিক স্তরে দেশসুদ্ধ ছেলেকে ইংরেজীর দিগ্‌গজ পণ্ডিত বানাবার অবাস্তব স্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে। পাঁচ বছরে হাজার আড়াই-তিন শব্দ আর সাধারণ দশ-বারোটি বাক্যগঠনরীতি আয়ত্ত করে মোটামুটিভাবে ইংরেজী পড়ে বুঝতে পারা, আর খুব সাধারণ ভাবের চার-পাঁচ প্রকারের বাগ্‌রীতির বাক্য লিখতে পারা—এইটুকু ক্ষমতা গড়ে দিতে পারলেই মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শেখানোর উদ্দেশ্য বহুলভাবে সিদ্ধ হবে। আসলে, এতকাল দেশসুদ্ধ ছেলেকে ইংরাজীতে পাকা বলিয়ে-কইয়ে লিখিয়ে বানাবার স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবে এর বেশী কিছু করা যায় নি। আর, যেটুকু করা গেছে, তাতেই কাজ হয়েছে। যারা এর চেয়েও বেশি শিখতে চাইবে তাদের কেউ আটকাতে যাবে না। তাদের জন্যে অজস্র বই আছে, নানান স্তরের জন্য সুন্দর সুন্দর অভিধান আছে, নতুন ধরণের সচিত্র ব্যাকরণ আছে, ইডিয়ম শেখার ভালো ভালো বই আছে।

কিন্তু যারা গড়পড়তা বুদ্ধিমান ছেলে, যাদের মোটামুটিভাবে শিক্ষিত কাজের ছেলে করে গড়ে তোলা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব, তাদের কিশোর-বয়সের দৈনিক আড়াই ঘন্টা ইংরেজীর জোয়ালে জুতে দেওয়ার মূঢ়তাকে আর সহ্য করা যায় না।

যে বাস্তববুদ্ধিবিচ্যুত শিক্ষানীতি কিশোর বিদ্যার্থীর এমন অবিমৃষ্য অপচয় ঘটাচ্ছে, সে নীতি চূড়ান্ত জাতিদ্রোহিতা; সে নীতির মার্জনা নেই। যাঁরা এ নীতির উদ্ভাবক, পরিচালক, আর যাঁরা এ নীতির অন্ধ নিশ্চিন্ত আত্মসন্তুষ্ট সমর্থক, সেই শিক্ষিতম্মন্য অপ-শিক্ষিত মানুষদের হাত দিয়ে জাতির সমূহ সর্বনাশ ঘটে চলেছে। এই আত্মম্ভরি অপশিক্ষিতদের সংশোধন অথবা নেতৃত্বচ্যুতি হতে যত বিলম্ব হবে জাতির সর্বনাশ তত গভীর হতে থাকবে।

অশোক ঘোষ

গ্রামের দিকে

কিছুদিন ধরে বলবন্ত মেহতার রিপোর্ট নিয়ে পত্রিকাদিতে আলোচনা চল্‌ছে। তার ফলে আমরা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার বর্তমানিক অবস্থান সম্পর্কে অল্পবিস্তর সজাগ আছি। 'আমরা' বলাটা সম্পূর্ণ সত্যানুসারী উক্তি হবে না। যারা আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের উন্নতির চিন্তায় গ্রামোন্নয়নকে মূল স্থান দেন, যারা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় গ্রামের বর্তমান সামাজিক চেহারাকে পষ্ট করে ধরে তুলতে উৎসুক— তারাই উপরের 'আমরাকে তৈরী করেছেন। এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একে ত ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের হার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে লজ্জাবনতা নববধূর মত মুখ বস্ত্রাঞ্চলে লুকিয়ে রাখতে হয়। তেম্নি শিক্ষিত লোকের হারের মধ্যে অনেক কম হারই এ সম্পর্কে অর্থাৎ গ্রামচিন্তায় নিজেদের নিমগ্ন (?) রাখেন। ভূদান আন্দোলনের যে সমস্ত কর্মী কাজ করছেন গ্রামে গ্রামে, তাদের গ্রামীন অবস্থার বাস্তব উন্নতিমূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় কতটুকু চিন্তা আছে, জানা নেই। তাদের কর্মপ্রেরণায় খানিকটা আদর্শপ্রভাব রয়েছে এটা অনস্বীকার্য্য। যারা গ্রামসেবকের কাজ করছেন, তারা কতটুকু গ্রাম-উন্নতির চিন্তার পরিমণ্ডলে বাস করেন, সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। সিভিল সাপ্লাই প্রভৃতি অধুনালুপ্ত ডিপার্টমেন্টগুলোর করনিকরা এখানে এসেছেন। তারা সরকারী চাকুরীর চিরকালীন বুর্জোয়া মনোভাব আর অলস কর্মপদ্ধতির আবহাওয়া নিয়ে ব্লক অফিসগুলোতে এসেছেন।

ভারতবর্ষের চিরাচরিত জীবনপদ্ধতির দূষিত শত্রুগুলোকে তাড়িয়ে দিতে হলে নিছক করণিক মনোবৃত্তি কোন সুফলই আনতে পারবে না। তার ওপর জীবনযাপনের প্রতি স্তরে বুর্জোয়া আর পিছু ছোঁয়া দৃষ্টিভঙ্গীর জঞ্জাল জমে আছে, আমাদের দেশের করণিক সমাজের মনোগত আর জীবনাচরণগত ইতিবৃত্ত যারা জানেন, তারা একথা স্বীকার করবেন যে শতকরা নব্বই জনের মধ্যে নতুন যুগ সম্বন্ধে সচেতন ধারণা নেই। আমি সময়-চেতনা আর সময়-চেতনার বা যুগসংক্রান্তির কালের সমাজ-ধারণার কথার উপর জোর দিতে চাই। অথচ করণিক সমাজের মধ্যে বুদ্ধি, চিন্তা, বিদ্যা, সংস্কারমুক্তি এগুলোর মনোরম সম্মিলন না হলে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন কি করে দেশের চেহারায় আসবে ?

বিশেষ করে গ্রামসেবকের কাজে নকলনবিশীর মনোবৃত্তি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা দরকার

মোটামুটি যে কথাটা পরিষ্কৃত হওয়া দরকার, তাহচ্ছে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কুসংস্কার, কু-আচার,কু -জীবনপদ্ধতি, কুসমাজ সংগঠন রয়েছে তার সঙ্গে লড়তে হলে চাই সমগ্র গ্রামীন আচার ব্যবহার, গ্রামীন সংগঠন, গ্রামীন সংস্কৃতি, গ্রামীন ভূমি-চেহারা, গ্রামীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্থ ধারণা, সংবেদনশীল উপলব্ধি, সদ্‌চিন্তাশ্রয়ী আদর্শবাদ, বলিষ্ঠ এবং বাস্তব পরিকল্পনা। আধুনিক যুগচেতনার আলোতে পরিবর্তন সংশোধন আর পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা দরকার। বলবন্ত মেহতা তাঁর রিপোর্টে যে বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ। ক্ষমতার বা শাসনপদ্ধতির গণ-তান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতার্পণ করে করে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতাদেয়ার কথা শাসণতন্ত্রের অর্টিকেল নং ৪০-এ উল্লেখ আছে। তাতে লেখা আছে, "The state shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government." মোদ্দা কথা গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের যে কথা বলা হয়েছে সেটাকে সফল করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন গ্রামবাসীদের হাতে পঞ্চায়েতের ভার অর্পণ করা দরকার। কিন্তু গ্রামে বাস করেন, এমন কজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ুয়া আছেন ? যারা কলেজে পড়েছেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষগুলোতে বিচরণ করেছেন, তারা শিক্ষার মূল আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পেটের দায়ে শহরগুলোতে তাদের মস্তিষ্কের পচন ধরাচ্ছেন। অনেকে আছেন, যাদের গ্রামে ঘর আছে, জমি আছে, দোকান আছে বা এককথায় ভালরকম খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকবার উপকরণ আছে, তারা শহরের মোহে গ্রামমুখী হবার কথা চিন্তা করেন না।

পঞ্চায়েতের সফলতা আনতে হলে যে ধরণের শিক্ষিত কর্মী দরকার সেধরণের লোকের অভাব খুবই বেশী গ্রামে। শুধু গ্রামবাসী কেন, গ্রামসেবকের-এর মধ্যেও।

আরো একটি সমস্যার চেহারা বিকটভাবে গ্রামোন্নয়ণের সফলতা আনবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিশ কোটি লোকের দেশে যেখানে শতকরা কুড়ি ও শিক্ষিত লোকের হার হয় নি, সেখানেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জঘন্য দলাদলি। বিরোধের অন্যায় প্রাচীর গড়ে চলেছেন তারা। ন্বর্বারির টাওয়ারে বসে উচ্চশিক্ষিতরা নিজেদের মধ্যে করেন কলহ, অল্প শিক্ষিতদের দিকে দৃষ্টি দেন অবহেলার, অশিক্ষিতদের করেন ঘৃণা। তাদের বেশীর ভাগের ভিতর না আছে শোভনতাবোধ, সুনীতিবোধ, সহৃদয়তা। উচ্চশিক্ষিতদের ভিতর এধরণের চিন্তার পিঠে 'মেড্ ইন্ য়োরোপ' ছাপ আছে। এভাবে তৈরী করছি নিজেদের ভিতর পার্থক্যের অসঙ্গত প্রাচীর। এ প্রাচীর যেতে পারে আত্মসমালোচনার দ্বারা। গুরুদেব স্বহস্তে ও সযত্নে আত্মসমালোচনার

পাঠ দেবার পরও আত্মফাঁকির জালিয়াতি আমরা কই আর দূর করতে পারলাম। এই যে অল্প-শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের কথা বলা হল, তাদের বেশীর ভাগই গ্রামের মধ্যে পড়ে আছেন।

ভারতের আত্মা এ গ্রামবাসীদের ভিতর রয়েছে। এদের ভিতর যেমনি বাস করে কুশিক্ষা কুসংস্কার এবং পেছনকে আঁকড়ে ধরা স্বভাবগত অভ্যাস, এর পাশাপাশি তেমনি বাস করে সহৃদয়তা, সরলতা, পরকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা। প্রথমগুলোকে দূর করে যদি পরিশোধিত মনোভাব অর্জন করানো যায় তবে তার সঙ্গে দ্বিতীয়টা মিললে ভারতের মানুষের কথা অনুসৃতব্য নজির হয়ে দাঁড়াবে। সহুরে উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিতরা এ তথ্য বোঝেন না। তারা গ্রামবাসীদের অবহেলা করেন, তুচ্ছ করেন। বাইরে যতই উন্নতির কথা বলা হোক না কেন, যতই মস্ত মস্ত কেতাব নিয়ে মাথা ঘামান না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বা কফির সরাইখানায় — এরকম মানসিকতা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। নগরলক্ষ্মী গ্রামলক্ষ্মীর থেকে বড় হয়ে আপন দর্পে চলবে— সে চলা মোটেই স্বাস্থ্যকর হবে না। বরং তার ভঙ্গীটা বারাঙ্গনা নারীর শিকার অন্বেষণের মত হয়ে দাঁড়াবে। দর্প, উগ্রতাবোধ শক্ত হাতে ছিঁড়ে না ফেললে গ্রামলক্ষ্মী নগর লক্ষ্মীকে বিশ্বাস করবে না। গ্রামবাসীদের সরলতা, ধর্মভীরু মনোভাবকে ঠিকমত আপন পরিবারের লোকজ্ঞান করে কাজে লাগালে ভারতের চেহারা অন্যরকম হবে। গ্রামীন সভ্যতা বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে শহুরে সভ্যতার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অন্যজাতির দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা ভারতের বুকে জটিল থেকে জটিলতরের দিকে যাত্রা করছে। তফাৎ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। যার জন্যে বলবন্ত মেহতার রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। "the spirit of self reliance is rather meltingaway." গ্রামবাসীদের ভিতর আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ কম্‌ছে তার কারণ, যারা পরিকল্পনা করেন, যারা পরি-কল্পনার রূপায়ণের কাজে বড় বড় পদে বসে আছেন তারা তাদের আত্মার আত্মীয় হতে পারেন নি। পারার চেষ্টাও করেন না। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মূল ভিৎ যদি তৈরী হয় তবে দুটো আশুপ্রয়োজনকে বাস্তব রূপ দেয়া দরকার। প্রথম — পঞ্চায়েতের ওপর গ্রাম পরিকল্প-নার সমস্ত না হোক প্রধান প্রধান দায়িত্ব দিতে হবে। 'টেকনিশিয়ান' ও 'ক্যাপিটাল' সরকার সরবরাহ কবেন পঞ্চায়েতের প্রয়োজন ও পরামর্শ অনুযায়ী। একজিকিউটিভ্ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পঞ্চায়েতের দ্বারা সম্পন্ন হবে। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চায়েতের সদস্য যারা হবেন তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গণতন্ত্র তখনই সফল হতে পারবে, যখনি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যে কোন বিষয়ে সুজ্ঞাত হবেন। আমরা ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যবিধির যে প্রবাহ লক্ষ্য করেছি, তাতে পঞ্চায়েত প্রথাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমে ঢালাই করে সাজাতে হবে। পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়ে যদি গ্রামকে সুস্থ ও সুস্পষ্টভাবে Administrative Unit-এ রূপ দিয়ে সেরকমভাবে তাদের ওপর গ্রাম শাসনের ভার দেয়া হয়, তবে পরিকল্পনার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের ভাব গ্রামবাসীদের ভিতর ক্রমশঃ জাগবে। প্রথম অবস্থায় শহুরেদের দিয়ে প্রস্তুতির কাজ শুরু করতে হবে। এ প্রস্তুতির কাজে দুটো দরকারী কথা স্মর্তব্য। প্রথম যে জেলার গ্রামে কাজ করা হবে, সে জেলার অধিবাসীদের সে সমস্ত গ্রামে পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়, যে সমস্ত শহুরেরা সেখানে যাবেন, তাদেরকে গ্রামীন অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে। এজন্যে 'ট্রেনিং' দরকার।

আসল কথা, এ শ্লোগান আমাদের বুদ্ধিজীবীদের তুলতে হবে—'গ্রামের দিকে মুখ ফেরাও।'

পবিত্র পাল

সমালোচনা

কিছু সময় অন্তর অন্তর, ধরুন, প্রত্যেক শতাব্দীর পর, কোন সমালোচক আবির্ভূত হয়ে আমাদের সাহিত্য-ইতিবৃত্তের অতীতকে যাচাই করে দেখবেন, কবিগোষ্ঠী ও কবিতাগুচ্ছকে নতুন কোন শ্রেণীবন্ধনে সাজিয়ে দেবেন, এ সকলেই চায়। এ কাজ পরিবর্তনের নয়, পুনর্গঠনের। এর পর আমরা যা দেখি তা সেই একই দৃশ্য, তবে একটা বিভিন্ন ও দূরতর দৃষ্টিকোণ থেকে সমুখে নতুন, প্রায় বিজাতীয় কতকগুলো বস্তু চোখে পড়ে, যেগুলোকে দিগন্ত প্রসারী পূর্ব-পরিচিতির সংগে নির্ভুলভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। পরিচয় প্রসাদপ্রাপ্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট হয়ত এতক্ষণে চর্মচক্ষুর অগোচর হয়ে গেছে—যিনি সর্বদর্শী সমালোচক, তিনি তাঁর জোরালো বীক্ষণকাঁচ দিয়ে অতিদূরদিগন্তের অনুপরমাণু আর হাতের কাছের জিনিষকে সমান মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারবেন। তিনি পুরোনো নতুন প্রত্যেকটি বিষয়কে জায়গামতো গুছিয়ে একটা সামগ্রিক অবস্থায় উপনীত হবেন। এই রূপকাশ্রিত আদর্শটি যেমন ড্রাইডেন, জনসন, আর্ণল্ড, তেমনি আংশিকভাবে বঙ্কিম, মোহিতলাল, রামেন্দ্রসুন্দর, বীরবল, বুদ্ধদেব বসু পালন করেছেন মানুষিক সীমার ভেতর। অধিকসংখ্যক সমালোচককেই আশা করা যায় বিগতযুগের শ্রেষ্ঠ সমালোচকের বৈদগ্ধ্য অনুকরণ করতে। আর-একটু স্বয়ংসিদ্ধ মন যাদের, তারা ধ্বংস করেন, অযথা স্তুতিবাদ ও পরিবর্তমান রেওয়াজে গা এলিয়ে দেন ,যতক্ষণ না নবীন কোন স্থিতিশক্তি উদ্ভূত হচ্ছে। এবং, শুধুমাত্র, সময় কাটছে, বা নতুন নতুন কলাপ্রাণালীর অভিজ্ঞতা জমছে, বা চিন্তাশীল মুষ্টিমেয়কে অনেক নিষ্কর্মা নকল করছে, বা, দ্রুতবুদ্ধি কয়েকজন নিয়ম উল্টে দিচ্ছেন এই কারণেই যে পুনর্বিচারের প্রয়োজন, তা নয়। দরকার এই জন্য যে, কলা বিশ্লেষণে প্রত্যেক পুরুষ বা 'জেনেরেশন' বিভিন্ন। ব্যক্তিবিশেষের মতো, মানবসমাজে পুরুষবিশেষও সাহিত্যচিন্তায় স্বকীয় উপলব্ধি নিয়ে আসে, সাহিত্যের ওপর নতুন চাহিদা জানায় ও সাহিত্যকে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। 'শুদ্ধ' কলা-উপলব্ধি একটা আদর্শ মোহ মাত্র, এবং যতদিন স্থানকালবদ্ধ কতকগুলো মানুষকে এইভাবে প্রয়াস পেতে হবে, ততদিন মোহমুক্তির আশা নেই। কলাকার ও দর্শক উভয়ই সীমিত। প্রত্যেক অবস্থায় প্রতিটি কারুকারের কার্য সিদ্ধির জন্য আবশ্যক কলা-রূপের বিশুদ্ধ ধাতুর সাথে প্রচুর পরিমাণে কল্পনার খাদ। এই খাদটুকুও পুরুষানুক্রমে বদলে যায়। সেইজন্য, যে কোন নতুন সমালোচনা গুরু নিত্যনতুন ভুল করে সাহিত্যের সেবা করে যান, এবং এই সমালোচকদের ধারা যতই সংখ্যাবৃদ্ধ হবে, ততই সংশোধন সম্পূর্ণতর হবে।

সমালোচনার একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই সব সময় যা, মোটামুটি কলাসৃষ্টির মর্মগ্রহণ ও রুচির সংস্কার সাধন বলে ধরা যায়। সমালোচকের কাজ তাহলে বেশ পরিষ্কারভাবে ছাঁটকাটা— তিনি আশানুযায়ী কাজ করছেন কিনা, কি ধরণের আলোচনা ফলপ্রসূ আর কি অপ্রাসংগিক, এ সব তথ্য স্থির করা তাহলে নেহাৎই ছেলেখেলা। অবশ্য, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সমালোচনা এই রকম সরল নিয়মানুবর্তী লোকহিতকর কার্যপ্রণালী নয় ঃ তা হলে ভণ্ডমাত্রই সহজে ধরা পড়ত। বরং, সমালোচনা যেন পার্কের রবিবাসরীয় বক্তাকলহ, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের অভিব্যক্তিটুকুও সুনির্ণীত নয়। মেনে নেওয়া যায়, এই হল শান্ত একত্রিত প্রচেষ্টার প্রশস্ত লীলাক্ষেত্র। সমালোচককে নিজের অস্তিত্ব অর্থপূর্ণ করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত অভিযোগ অনুযোগ দমিয়ে রাখতে হবে, ও নির্ভুল বিচারের অখণ্ড এষণায়, যতদূর সম্ভব নিজের তফাৎগুলোকে সহ-সমালোচকদের সাথে সংগত করে নিতে হবে। যেখানে ঠিক এর উল্টো পরিবেশ, সন্দেহ হয়, সেখানে সমালোচকের জীবিকা তাঁর সহিংস ও চরমপন্থী মতের ওপর নির্ভরশীল,

কিংবা, এমন কয়েকটি ব্যক্তিগত বাতিকের ওপর, যা মানবসাধারণের মতামতের সংগে দিব্যি মিশিয়ে নেওয়া চলে। এ ক্ষেত্রে এই জাতটাকেই উচ্ছন্নে পাঠিয়ে দেওয়া শ্রেয়।

এতবড় একটা অপরাধ ঘোষণা করে দেবার পর আমাদের রাগ যখন একটু পড়ে আসবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এমন কয়েকটি বই, কয়েকটি রচনা, খানকয়েক বাক্য, জনকয়েক লোক বাছাই করা যায়, যা ও যাঁরা আমাদের কাছে 'প্রয়োজনীয়'। এইরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমরা এদের ছকে ফেলব, বুঝতে চেষ্টা করব কি কি নিয়ম মেনে গ্রন্থের গুণ বিচার করা চলে, কোন কোন উদ্দেশ্য ও প্রণালী মনে রেখে সমালোচনা করা ন্যায়সম্মত।

কি আমাদের দরকার আর কি নয়, তা আমাদের নিজেদেরই স্থির করতে হবে, এবং খুব সম্ভব এই ধরণের স্থির সিদ্ধান্তে সরাসরি আমরা উপনীত হতে পারব না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে 'ব্যাখ্যা' একমাত্র তখনই ন্যায্য যখন তা ব্যাখ্যাই নয়—বরং পাঠককে তা এমন কয়েকটি তথ্য জানিয়ে দেবে, যা এমনিতে হয়ত তার নজরে পড়ত না। ছাত্রদের কোন বিষয়ে উৎসাহ জাগাতে হলে দুটো পথ আছে — হয়, কোন একটি রচনা সম্পর্কে তাদের সাধারণ বর্ণনাবর্জিত একটা বিশ্লেষণ (উপজীব্য, পরিবেশ, জন্মরহস্য) দিন, নয়ত, এমনভাবে রচনাটির উত্থাপন করুন, যাতে অযথা কোন বিতৃষ্ণা ওর বিরুদ্ধে না জন্মাতে পারে।

তুলনা ও বিশ্লেষণ সমালোচকের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। যেহেতু এগুলো অস্ত্র, এগুলো খুব সাবধানে প্রয়োগ করতে হবে, কেবল ইংরেজী নভেল-এর ইতিহাসে কতবার জিরাফ বা হাতীর উল্লেখ আছে, তার অনুমান করতে নয়! অনেক সমকালীন লেখক এদের নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। কি তুলনীয় আর কি বিশ্লেষণযোগ্য, তাত অন্ততঃ জানা চাই টেবিলে শোয়ানো লাস থাকলেই নির্বিশেষে তুলনা-বিশ্লেষণ করা চলে; 'ব্যাখা' অনবরত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টেনে তুলে নাড়াচাড়া করে আবার তাদের স্বস্থানে রেখে দিচ্ছে। কোন বই, রচনা বা টীকা যদি কলাকারু সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতম সত্যও প্রকাশ করতে পারে, তবে তা ভণিতাশ্রয়ী 'জর্ণাল'-জঞ্জালের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী। অবশ্য, আমাদের ভেবে নিতে হচ্ছে যে আমরা তথ্যের দাসানুদাস নই, সত্যসংগ্রহের শাহেনশাহ। শেক্সপীয়র-এর ধোপার হিসেব খুঁজে পেয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ কোন উপকার হবে না; তবু শেষ কথাটি না-বলাই রাখব কারণ এমন কোন যুগাবতার হয়ত আসবেন, যিনি ঐ হিসেবগুলোকেই কাছে লাগাবেন। জ্ঞানগরিমার অধিকার আছে—তার সদ্ব্যবহার করা যায়, অপব্যবহারও করা চলে। সমালোচনা প্রধান লেখার ছড়াছড়ি হলে এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন আসল বই-এর চেয়ে বই-এর সমালোচনা পড়তেই মন চাইবে; রুচিশিক্ষা না দিয়ে এই রচনাগুলো কেবল মতামত প্রস্তুত করবে।

সত্যলাভ রুচির অনিষ্ট করতে পারবে না, বড়জোর কোন এক বিশেষ রুচির নিবৃত্তিসাধন করবে—ঐতিহাসিক ঘটনা বা জীবনী সম্পর্কে কৌতুহল সৃষ্টি করবে। সত্যিকারের অপরাধী তাঁরা, যাঁরা উৎকট মতবাদ বা কল্পনা সরবরাহ করে থাকেন। গ্যেটে, কোলরিজ এদিক দিয়ে নির্দোষ নন ঃ 'হ্যামলেট' সম্পর্কে কোলরিজ-এর যে মন্তব্য, তা কি তথ্যানুরূপ বিশ্বাসযোগ্য জিজ্ঞাসা, না, লেখকের সাজসজ্জা জাহির করবার প্রচেষ্টা ? এ নিয়ে তর্কের অবকাশ অনেক।

দীপক রুদ্র

টি. এস. এলিয়টের দি ফাংশন অব্ ক্রিটিসিজ্‌ম্ অবলম্বনে

সমাজ সমস্যা

অধিক উৎপাদন ও সুসম বণ্টন

কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক যে কোন স্তরের মন্ত্রীর বক্তৃতাতেই সাধারণতঃ একটা বাঁধা গৎ শুনতে পাওয়া যায়। এই গৎটি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী একটি শ্লোগানের আকারেও পেশ করেছেন। "উৎপাদন কর, নয়ত মর"। জওহরলালজী আধুনিক ভারতের 'জনগণ মন অধিনায়ক।' তাঁর আহ্বান বহুবার জাতির মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। তবু যে তাঁর অধিক উৎপাদনের আহ্বান আজ প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ, এর কারণ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা দরকার।

অর্থতত্ত্বের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের সঙ্গে যে বস্তুটি অঙ্গাগীভাবে জড়িত, তার নাম বন্টন। এর একটিকে অবহেলা করে অপরটি সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন অজ্ঞাত কারণে সুসম বন্টন সম্বন্ধে স-রবে ঘোষিত সরকারী সদিচ্ছা প্রকৃতপক্ষে সরকারী কার্যপদ্ধতিতে প্রতিফলিত হতে পারে নি। জনসাধারণ অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত নয়, কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতায় তারা এটুকু ভালভাবেই জানে যে উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন হলেও, বর্দ্ধিত উৎপাদনের সুষ্ঠু বন্টন ব্যাতিরেকে তাদের ভাগ্য কোনভাবেই উন্নত হবে না। তাই অধিক উৎপাদনের আহ্বান তাদের কাছে অর্থহীন; এবং সরকারী বন্টনব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের সঙ্ঘ শক্তির মাধ্যমে জাতীয় আয়ের সুষ্ঠুতর বন্টনের জন্য চেষ্টা করছে। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ এবং ধর্মঘট ইত্যাদি সেই প্রয়াসেরই বাস্তব প্রতিফলন।

এখানে বলা দরকার যে অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য মূলধন সৃষ্টি করতে হবে; ভোগ্যপণ্যের উপভোগ না কমিয়ে (ভারতের মত সামান্য জীবনযাত্রার মান সম্পন্ন দেশে যা অকল্পনীয়) যদি মূলধন সৃজনের হার বাড়াতে হয়, তবে সেজন্য জাতীয় আয় বাড়ানো অত্যাবশ্যক। এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য অধিক উৎপাদন যে প্রথম সর্ত, তা বোঝাবার জন্য বিস্তর কালি খরচের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু অধিক উৎপাদন সম্বন্ধে সরকারী মহলের উৎসাহ বিশেষ লক্ষ্যণীয় হলেও, অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সুসম বণ্টনেরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা আমাদের সরকারী মহল কার্যতঃ মানেন বলে পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথমে বাড়তি উৎপাদন, পরে সুসম বন্টন এই মনোবৃত্তি যে শুধু সামাজিক দিক দিয়ে অবাঞ্ছিত তাই নয়— অর্থতাত্ত্বিক বিচারেও অবৈজ্ঞানিক। তবু সরকারী মহল প্রকৃতপক্ষে এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সুড়ঙ্গপথেই বিচরণ করতে অভ্যস্ত।

অথচ বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে নিছক উৎপাদন বাড়াবার জন্য-ই যে বর্দ্ধিত কর্মপ্রেরণা দরকার, ভারতের মত পেছিয়ে পড়া দেশের অর্দ্ধভুক্ত শ্রমজীবিদের জীবনযাত্রার মানের পরিলক্ষণীয় উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তা আসা অসম্ভব।* কিন্তু এছাড়াও অনুন্নত অর্থনীতিতে সুসম বন্টনকে আরও কতগুলি কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া চিত। প্রথমতঃ আয় ও

* "সমাজসমস্যা" পর্যায়ে পূর্বপ্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সম্পদের আসন বণ্টন বজায় থাকলে, ধনিকশ্রেণীর হাতে প্রয়োজনের বহুগুণ অতিরিক্ত অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে। ভারতের মত অনুন্নত দেশে ধনিকশ্রেণীর লোকেরা—বিশেষতঃ মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, প্রভৃতি দেশীয় শ্রেষ্ঠি ও বণিকগোষ্ঠী, আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও শিল্পসংগঠন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না বা জানবার চেষ্টা করেন না। সুতরাং বহু ঝুঁকি ও পরিশ্রমের বিনিময়ে আধুনিক যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে তারা নিতান্তই নিরুৎসুক। যন্ত্রশিল্পের চাইতে অনেক বেশি মুনাফার প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ফাট্‌কাবাজার বাণিজ্য ও জমি কেনাবেচার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি।** এই সব 'বহুৎ নাফা'র সম্ভাবনাযুক্ত ক্ষেত্রে টাকা খাটিয়েও যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা প্রায় সবই তাঁরা ব্যয় করেন বিলাসদ্রব্যের পেছনে। বিদেশী বিলাসদ্রব্যের উৎকর্ষ বেশী; তাই আমাদের সম্পদশালী লোকেদের বিলাসোপভোগ শেষ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্যের আমদানীই বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং অসম বন্টনের ফলে আমাদের জাতীয় আয়ের এক বিশিষ্ট অংশ অপ্রয়োজনীয় আমদানীর ছিদ্রপথে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বিদেশজাত বিলাসসামগ্রী আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে ও তাদের ওপর চড়া হারে শুল্ক বসিয়েও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ এ সবের ফলে বিদেশী পণ্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তাদের আকর্ষণও বাড়ে; ফলে অল্প পণ্যের জন্যই প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যায়। সুতরাং ভারতের মত দেশে বর্তমান অবস্থায় সম্পদ বন্টনে অসাম্য যে শুধু প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের ধারণার বিরুদ্ধে শিল্পায়নের সহায়ক হতেই অসমর্থ হয় তা নয়, প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক দেনাপাওনার হিসেবের ওপর প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এর পরিবর্তে সুসম বণ্টন ও অধিক উৎপাদনকে যদি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে তুল্যাধিকার দিয়ে গ্রহণ করা হোত, তবে বিলাসসামগ্রী আমদানীর ছিদ্রপথে এত সুবিপুল অর্থ অপচায়িত হোত না। কারণ আমাদের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীগুলির অত্যাবশ্যক চাহিদাই পুরোপুরি মেটে না বলে, আয় বাড়লে সেই চাহিদাই তারা প্রথমে মেটাবে; বহুমূল্য বিদেশজাত বিলাসসামগ্রী কিনে দেশের সম্পদ অপচয় করবে না। শিল্পজাত সামগ্রীর মধ্যে যেগুলি অত্যাবশ্যক শ্রেণীতে পড়ে, বর্ত্তমানে তার প্রায় সবই (যেমন জামাকাপড়, জুতো প্রভৃতি) এদেশে তৈরী হয়। সুতরাং তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দেশী শিল্পগুলির বাজারই প্রসারিত হবে।

অনেকে বলেন যে সুসম বন্টনের ফলে বর্তমান অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি ঘট্‌তে পারে। তাঁদের মতে দরিদ্র শ্রেণীর আয় বাড়লে তাঁরা অধিক পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারে প্রয়াসী হবেন; কিন্তু যেহেতু অল্পসময়ের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের যোগান সমতালে বাড়ান সম্ভব হবে না, সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে।

উৎপাদন স্থির রেখে আয়ের পুনর্বণ্টন করতে গেলে অবশ্য এ বিপদ দেখা দিতে পারে। কিন্তু পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়াতে যেমন সময় লাগে, সেরকম সম্পদ ও আয়ের

** ভারতের শিল্পপরিচালক শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের Prof Oscar Ornati বলছেন, Conservative in the political and social sense, they are generally better prepared for finance and trade than for industry. Management shows a tendency towards ......inefficiency in most;......it is characterised by a desire to get rich quick; it is unwilling to invest capital with an expectation of a moderate return over a period of years; and it concentrates on high cost, but also high profit production. (Organised Labour's Impact on Indian Industralization; Labour Management and Economic Growth).

পুনর্বণ্টন করতেও সময় লাগে। উৎপাদন ও পুনর্বণ্টন এদের একটি দীর্ঘকালীন ও অন্যটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি হ'লে মোট চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বৈষম্য দেখা যেত। কিন্তু যেহেতু দুটিই সময়সাপেক্ষ, সেজন্য একে অন্যকে সাহায্যই করবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন গৃহীত সংকল্প অনুযায়ী বেড়েছিল; কিন্তু বণ্টনব্যবস্থার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য না দেওয়ায় শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা সমতালে বাড়েনি। ফলে বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি অনেক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পেই সাময়িকভাবে বাড়তি মাল জমে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ভারতের মত জনবহুল দেশে এরকম ঘটনা ঘটার কারণ হচ্ছে এই যে দেশের গরিষ্ঠতম জনসংখ্যার নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য তাদের শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নিদারুণভাবে সীমাবদ্ধ। পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বাড়া সত্ত্বেও তার প্রধান অংশ সম্পদশালী লোকেদেরই কুক্ষিগত হওয়ায়—এবং তাদের স্বদেশজাত পণ্য উপভোগের প্রবণতা কম হওয়ায়—প্রথম পরিকল্পনার শেষেও ভারতের শিল্পপণ্যের বাজার আকারে বাড়ে নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও এ সমস্যা থাকা অসম্ভব নয়।

পরিকল্পনার অর্থ কেবলমাত্র কয়েকটি শিল্পে বা বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী (কিম্বা বেসরকারী বরাদ্দের) তালিকা তৈরী করা অথবা নির্দিষ্ট হারে উৎপাদন বৃদ্ধির সংকল্প নেওয়া নয়। সত্যিকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতির কাঠামোতে গুণগত রূপান্তর ঘটাবার বিশেষ এক পদ্ধতি। উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার যথাযথ পুনর্গঠন—তথা সমগ্র প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপান্তর ছাড়া পরিকল্পনায় প্রকৃত সাফল্য অসম্ভব। আর এইদিক দিয়েই শুধু বাঞ্ছনীয় শিল্পগুলির বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, আরও সম্পদের সুসম বণ্টনের তাৎপর্য্যও অবশ্যস্বীকার্য্য। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

সুব্রতেশ ঘোষ

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

গত আষাঢ়সংখ্যা সমকালীন-এ 'সৌমিত্রসংঘ'এর 'দুই পুরুষ' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী যে সব কথা বলেছেন তার সমন্ধে আমাদের বলার কিছু নেই; কিন্তু তিনি গোল বাধিয়েছেন প্রথমেই কতকগুলি অকারণ মতামত রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে প্রকাশ করে।

প্রথমেই তিনি বলছেন যে বাংলার রঙ্গমঞ্চগুলির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কথাটা আংশিক সত্য; বহিরঙ্গের আমূল পরিবর্ত্তন যে ঘটেছে তা অনস্বীকার্য্য। দশবছর আগেও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত রঙ্গমঞ্চ কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের (পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কথাই বলছি) সামাজিক নাটক কি গিরিশচন্দ্র ও শিশির ভাদুড়ীর যুগ থেকে এগিয়ে এসে প্রথম অভিনীত হচ্ছে? (লেখিকার ভাষা থেকে অন্ততঃ সেইরকমই যেন বোধ হচ্ছে;) তাঁর বোধহয় স্মরণ নেই যে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনীত নাটকটিই একখানি সমাজিক নাটক। শুধু সামাজিক নাটক বললেই তার সম্বন্ধে সব বলা হয় না। আজ পর্য্যন্ত যত সামাজিক নাটক লিখিত, মুদ্রিত বা অভিনীত হয়েছে তাদের মধ্যে তার স্থানই সবার উপরে, কি চরিত্রচিত্রণ, কি অভিনয়, কি নাটকীয়তা—সব দিক থেকেই বাংলা সামাজিক নাটকের চরম উৎকর্ষতা তাতে প্রকাশমান। আমি 'নীল দর্পণের' কথা বলছি। (কিন্তু নব নাট্য আন্দোলনের দৌলতে এর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় তাঁদের পক্ষে নাটকটির পুরোনো ঐতিহ্যভুলে যাওয়া অবিশ্বাস্য হলেও অসম্ভব নয়। (গিরিশচন্দ্রের যুগে লেখিকার মতে কি শুধু পৌরাণিক তথা ঐতিহাসিক নাটকই অভিনীত হ'ত? প্রফুল্ল, বলিদান, শাস্তি কি শান্তি, পরপারে, পথের শেষে প্রভৃতি নাটক তাহলে কোন শ্রেণীতে পড়বে? শিশির ভাদুড়ীও কি শুধু আলমগীর, চন্দ্রগুপ্ত আর সীতাই অভিনয় করেছেন? তাঁর দ্বারা অভিনীত—বিজয়া, রমা, অচলা, বিপ্রদাস, ষোড়শী, সধবার একাদশী, জীবনরঙ্গ প্রশ্ন, পরিচয় কি সামাজিক নাটক নয়? তাঁর যুগে অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে যে মহানিশা, পথের দাবী, কঙ্কাবতীর ঘাট অভিনীত হয়েছিল, সেগুলোই বা কোন শ্রেণীতে পড়ে?

নাটকের রজত জয়ন্তী পালন করার কৃতিত্বটা কি? নাটক কি সিনেমা যে পঁচিশ সপ্তাহ এক নাগাড়ে চললেই (এখন আবার তিন চারটি হলে চলার সময় যোগ করে) রজত জয়ন্তী সপ্তাহ পালন করা হবে? নাটক অন্ততঃ পঞ্চাশ রজনী না চললে কোন কিছু পালন করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করে না।

লেখিকা যে পরীক্ষা-নিরিক্ষার কথা বলেছেন সেটা কি শুধু নতুন নতুন নাটক পরিবেশনার? সে পরীক্ষা-নিরিক্ষা'ত মঞ্চের আদিকাল থেকেই চলছে। আর আঙ্গিকের বা পরিবেশনার পরীক্ষানিরিক্ষাও নতুন কিছু নয়। সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এটাও বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম যুগ থেকেই সত্য। আর দর্শকদের রুচি পরিবর্ত্তনের কথা যদি বলেন, উল্কা, শ্যামলী বা ক্ষুধার সাফল্যটা এ পরিবর্ত্তন যে শুভ কিছুর দ্যোতক এ বোধ জন্মায় না।

রবি মিত্র

সাহিত্যপাঠের ভূমিকা ॥ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ০·৫০ টাকা।

আলোচ্য বইখানি বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালার ১২৫তম পুস্তক। কৃতী অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক হিসাবে লেখকের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। বাঙ্গলাভাষায় সাহিত্য বিচার সম্বন্ধে পুস্তক সংখ্যা পরিমিত, এই পরিমিত আলোচনার ক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠের ভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইখানিতে ছাত্রসুদন পাণ্ডিত্যের পরিচয় অপেক্ষা সহৃদয় সাহিত্যপাঠকের মানসিকতাই প্রতিফলিত হইয়াছে। দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। সরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতার অবসরে এই জ্ঞানতপস্বী দর্শনের নানা বিভাগকে স্বীয় মৌলিক চিন্তা দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গত ভট্টাচার্য মহাশয়ের অলৌলিক পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সুলভ প্রচার বিমুখতার জন্যই জনসাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে নাই। ইহা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র একবার ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দেশে ও বিদেশে বিস্তৃত হইতেছে। ইহা আনন্দের কথা। আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র রসোপলব্ধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন Heart universal ও বিশ্বজনীন চিত্তের পরিকল্পনা করিয়া। রসাস্বাদ কবি ও রসিক পাঠক অনুভব করেন যে এই অনুভূতি বিশ্বের অনুভূতি, আত্মসচেতন বিষয় পাঠক এই সার্বিক অনুভূতির অংশীদার হইতে পারেন। সাহিত্যপাঠের ভূমিকায়ও পূর্বাচার্যদের মতের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণচন্দ্রের মতবাদটি লেখক নিপুণতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন।

পরীক্ষার্থী ছাত্র ও জিজ্ঞাসু সাহিত্যপাঠক এই দুই শ্রেণীর পাঠকই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥ বিমল সিংহ ॥ মিত্রালয়। মূল্য চার টাকা।

শ্রীযুক্ত সিংহ প্রবন্ধকার হিসাবে সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। সমালোচক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ইতিপূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য গ্রন্থেও তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় আছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। গত বারো চোদ্দ বছর বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সমাজচেতনার নামে অত্যন্ত একদেশদর্শী হয়ে পড়েছিল। সমাজ সম্পর্কে সমালোচকের নিজের ধারণার সঙ্গে না মিললেই সে রচনায় তাঁরা সামাজচেতনার অভাব খুঁজে বার করতেন। এই ধরণের সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িকতার গুরু

বলেছেন আর দলীয় সাহিত্যিকদের নতুন যুগের সমাজ সচেতন সাহিত্যের পুরধা বলে ঢাক পিটিয়েছেন। বিমলবাবুর চিন্তাশক্তি যে ঐ জাতীয় বিকারের দ্বারা আচ্ছন্ন নয় তা এই গ্রন্থের যে কোন প্রবন্ধই প্রমাণ করবে। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেও এই সমস্যার অবতারণা করেছেন—"বঙ্কিমী যুগে যে সব সমালোচক অবান্তর নীতির দোহাই দিয়ে সাহিত্যের বিচার করতেন আজ যদি তাঁদের নিন্দায় আমরা মুখর হয়ে থাকি তাহলে একথাও বলতে হবে যে যাঁরা প্রলেটারিয়েট সাহিত্যের ধ্বজা আস্ফালন করে কাস্তের মত চাঁদ আর রেয়নেটের মত বিদ্যুৎ না দেখলেই সকল কাব্যকে বিনিপাত বলে ধিক্কার দিতে সমুৎসুক তাঁরাও আসলে ঐ গোত্রীয়।" (কবিকৃতি ও সমালোচনা পৃঃ ৬১) অনেকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি এই গ্রন্থ। সব প্রবন্ধ অবশ্য মূল্যের দিক থেকে সমান নয়। 'একটি প্রাচীন কাব্যে বাংলা সমাজ চিত্র'—এ গ্রন্থে বেমানান হয়ে গেছে। কারণ সে প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য নেহাতই তুচ্ছ। যেখানে নানা বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ লেখকের উদ্দেশ্য সেখানে উপরোক্ত প্রবন্ধ সামঞ্জস্য রক্ষা করে না।

বিমলবাবুর রচনা সর্বত্র একই ভঙ্গী অনুসরণ করে নি। কোথাও তা বেশ সহজ গল্প বলার ভঙ্গীতে চলেছে কোথাও চিন্তার ঠাসবুনুনিতে দৃঢ়বদ্ধ। গভীর চিন্তামূলক প্রবন্ধের উপযুক্ত ভঙ্গী বটে—তবু একটা কথা না বলে পারছি না; কোথাও দীর্ঘ উধৃতি অনাবশ্যক হয়েছে এবং নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। লেখক যদি মূল বক্তব্য নিজেই সংক্ষিপ্ত করে বলে দিতেন তাহলে গ্রন্থের আয়তন সংক্ষিপ্ত হলেও ক্ষতি হতো না।

শবরী ॥ সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥ দাম দেড় টাকা ॥ মিত্রালয়, কলিকাতা-১২ ।।

বাংলা-সাহিত্যের কাব্য-নিকুঞ্জে বর্ণে গন্ধে বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে যে-কয়টি কুসুম সাম্প্রতিক-কালে বিকশিত হলো, 'শবরী' তার মধ্যে একটি। এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ। প্রথমটিতে সতরোটি মৌলিক কবিতা; দ্বিতীয়ে এগারোটি অনুবাদ ও তৃতীয়ভাগে একটি ক্ষুদ্র কাব্য-নাট্য। কবি বয়সে নবীন হলেও তাঁর কবিতাগুলিতে প্রগল্‌ভতা বা চিন্তার চঞ্চলতা নেই। বরং ভাবে ভাষায় প্রবীণ কবিমানসের সংযমের সুপরিচয় বহন করে অনেকগুলি কবিতা। যেমন ঃ নীলকণ্ঠ, শবরী সত্য-শিব, নির্ভয়, প্রগল্‌ভ, লীলাবসান। কবিতাগুলিতে প্রবীণের জীবনদর্শন আছে; যে-দর্শন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তিক্ততার পথ বেয়ে এসেও বড় আশাবদী। কবি বলেছেন ঃ

এ-ধরায় আছে কুটিল দ্বন্দ্ব, রয়েছে কলুষ লোভ—
আছে কুশ্রীতা, মলিন দৈন্য, আছে নিরাশার ক্ষোভ।

কিন্তু তবু ভরসার কথা এই যে—

"আছে এরও মাঝে নররূপী নারায়ণ—"

বলছেন ঃ

"আকাশে আকাশে কৃষ্ণকুটিল পুঞ্জমেঘ,—
তোলে তরংগ প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণাঝড়—"

কিন্তু তবু

"জানি নিশ্চয় বিভীষিকাময় সে-ঘোর রাত্রি সত্য নয়
চিরশাশ্বত সুনীল আকাশ আর ধ্রুবতারা জ্যোতির্ময়"

আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট মৌলিক কাব্যগুলির মধ্যে কবি যতীন বাগচী ও করুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাধারা প্রবাহিত দেখে আমরা কবি সুনীলকুমার সম্বন্ধে আশান্বিত রইলাম। কিছু মৌলিক রোমান্টিক কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলে সংকলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন ঃ কাব্যনাট্য এযুগে কেহ লেখেনা—নাটক ও কবিতা পৃথক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কাব্য ও নাট্য একদেহে বেশ মানানসই হইয়াছে, দুয়েরই ধর্ম বজায় আছে। × অনুবাদগুলি বলিয়া না দিলে, অনুবাদ বলিয়া চেনা যায় না।'

সরিৎশেখর মজুমদার

ইংরেজের দেশে ॥ কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থজগৎ— ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

সমসাময়িক বাঙলা ভ্রমণকাহিনীর ফ্যাসানে নিজেকে ভাসিয়ে সাহিত্যের বহুপ্রসূতায় দৈব্যৎ আনন্দ লাভ করেছি। বিশেষত যখন দেখেছি স্বনামধন্য কথাকারেরাও দু-দশ দিনের অভিজ্ঞতার সাহায্যেই কোনো দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ব্যবধানকে অতিক্রম করার মতো যথেষ্ট সময় বা সুযোগ না পেয়েও সে সম্পর্কে বহু পৃষ্ঠা ব্যাপী সুবিস্তৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ করে চলেছেন, তখন বিচলিত না হয়ে পারি নি। কেননা সাহিত্য-ব্যবসায়ী ব্যতীত আর সকলের কাছেই এ জাতীয় রচনার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ইংরেজের দেশে' গড়ে স্বভাবতই ভাববিলাসী, উচ্ছ্বাসপ্রবণ কিংবা দার্শনিকতত্ত্বে প্রগলভ বাঙালী ভ্রমণ কাহিনীকারদের মধ্যে লেখক কুমারেশ ঘোষকে অকস্মাৎ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলেই মনে হলো।

'ইংরেজের দেশে' কোনো সাহিত্যিক প্রাথর্যে হতচকিত করে না, বরং এখানে পাই এক সাহিত্যরসিক মনের হাস্যদীপ্ত সঙ্গ, যা নিরপেক্ষ অথচ স্বাভাবিক মানব প্রেমিকের চোখ দিয়ে বহুশ্রুত একটি দেশ ও তার মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করতে উৎসুক। তবু এ বই-এর আসল মূল্য প্রাচীনপন্থী ইংলণ্ডের সঙ্গে আধুনিক বাঙালী পাঠকদের পরিচিত করার জন্য ততোটা নয় যতোটা স্বাধীন ভারতের কোনো এক নাগরিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্য। লেখকের মুক্ত মন দু চোখ খুলে দেখেছে যুদ্ধ পরবর্তী ইংলণ্ডকে পেয়েছে তার কৃসংস্কারাচ্ছন্ন ক্ষয়িষ্ণু মনের পরিচয়, জেনেছে ক্লেদ ও গ্লানিকে, অথচ সেই সঙ্গে চিনতে ভুল করেনি সে দেশের সেই সব মানুষকে যাঁরা বর্ণের ব্যবধানকে অস্বীকার কোরেও একজন ভারতীয়কে ভালো বেসেছিল। লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত মন মুহূর্তের জন্যেও কোথাও আত্মবিস্মৃত কিংবা বিগলিত হয়ে গড়ে নি। তাই তাঁর রচনা সকলকেই, বিশেষ করে এদেশের নবীনদের (যারা ইংরেজের প্রতি দাসসুলভ মানসিকতায় অভ্যস্ত হয় নি) ওদের সমাজের দোষ, গুণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে নির্ভরশীল তথ্যে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করবে। লেখক ইংলণ্ডে গ্রহীতা কিংবা দাতার ভূমিকা নিয়ে যাননি, তিনি গিয়েছিলেন নিতান্তই সে দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে। তাই ইংরেজ চরিত্রের যে গুণগুলির দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা আজও হয় তো অনন্করণীয় নয়।

কুমারেশ বাবুর স্বভাবসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা ও ভাষার মাধুর্যের জন্য কাহিনী কোথাও বাধা না পেয়ে স্রোতস্বিনীর মতোই দুই তীর ও আকাশের নানা বর্ণের প্রতিবিম্ব বুকে নিয়মিত পরিণতির দিকে বয়ে গেছে। তা ছাড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যে বিমূঢ় করার চেষ্টা করেন নি বলে তিনি পাঠকদের কাছে ধন্যবাদ পাবেন।

অশোক ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র রচনাবলী

সংগ্রহ-পদ্ধতি

বিশ্বভারতী কার্যালয়ে (৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭) চিঠি লিখিয়া স্থায়ী গ্রাহক হওয়া। গ্রাহক হইবার জন্য স্বতন্ত্র কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না, চিঠি লিখিয়া দিলেই চলে।

আপনি যদি ইতিপূর্বে কোনো খণ্ড ক্রয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে চিঠিতে সে কথা জানাইবেন। খণ্ডগুলি ক. কাগজের মলাট, অথবা খ. সাধারণ কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই, কিংবা গ. মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই, কি না তাহাও জানাইবেন। ভবিষ্যতে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হইলে, বা পূর্ববর্তী যে-সকল খণ্ড এখন ছাপা নাই সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হইলে, গ্রাহকদের জানানো হয়।

॥ মোট ২৬ খণ্ডের মধ্যে বর্তমানে পাওয়া যায় ॥

ক. কাগজের মলাট সংস্করণ, প্রতি খণ্ড ৮৲

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ১১. ১২. ১৩. **১৪.**
১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. **২১.** ২২. ২৫. ২৬.

খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই, প্রতি খণ্ড ১১৲

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ১১. ১২.
১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯ ২০. **২১.** ২২.

গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই, প্রতি খণ্ড ১২৲

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.
১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২.

॥ নবম খণ্ড ॥

ক. কাগজের মলাট ৯., রেক্সিনে বাঁধাই খ. ও গ. যথাক্রমে ১২৲ ও ১৩৲

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হেতু নবপ্রকাশিত এই খণ্ডের মূল্য স্বতন্ত্র হারে নির্ধারিত হইল। পূর্বমুদ্রিত খণ্ডগুলির মূল্য অপরিবর্তিত রহিল।

বিশ্বভারতী